মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই,

মহোদয়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বনগ্রাম ইংরাজী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক

শ্রীআশুতোষ ঘোষ দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৩ নং, ময়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট. কলিকাতা।

কলিকাতা,

২৯ নং, বীডন ষ্ট্রীট, এম্‌ প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই,

মহোদয়ের

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বনগ্রাম ইংরাজী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক

শ্রীআশুতোষ ঘোষ দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৩ নং, নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,

২৯ নং, বীডন ষ্ট্রীট, এল্ম্ প্রেসে

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২ সাল।

ভূমিকা।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি,আই,ই, মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের পাঠোপ-যোগী করিবার জন্য এই পুস্তক সরল ভাষায় লিখিত হইল। ইহাতে তাঁহার রাজকীয় কার্য্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করা হইয়াছে ও তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজি কবিতার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনি যে যে স্থান হইতে পদ্য ও সঙ্গীত উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার কতকগুলিন, অনেক চেষ্টায়, সংগ্রহ করিয়া, প্রকাশিত করিয়াছি। বরিশাল, ময়মনসিংহ, মেদনীপুর ও বাঁকুড়া সংবাদ-দাতার পত্র হইতে তাঁহার জিলা শাসন সম্বন্ধের অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি। রমেশ বাবুর "ভারতবর্ষ ভ্রমণ বৃত্তান্ত" নামক ইংরাজি পুস্তক হইতে কোন কোন বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। পুস্তকের প্রথমে রমেশ বাবুর একখানি উৎকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তী দিয়াছি। তাঁহার বাঙ্গালা পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারি নাই, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন। বারান্তরে এই অভাব পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি জনসাধারণের নিকট আদৃত হইলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩০২ সাল।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।

মাননীয় শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ইর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত।

ভারতবর্ষে বিখ্যাত লোকের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ প্রায় দেখা যায় না,—সেই কারণ অল্প লোকের জীবনী আমরা অবগত আছি। খ্যাতিমান লোকের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। ইউরোপবাসীরা কি প্রকারে বিদ্যার গৌরব, গুণের প্রশংসা, মহৎ কার্য্যের ও সৎ সাহসের পুরস্কার, গ্রন্থকারের সম্মান করিতে হয়, তাঁহাদিগের লিখিত জীবনচরিত্র পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি। যদিও পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে অনেক বীর পুরুষ এবং বিদ্বান লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ না থাকায় তাহাদিগের কার্য্যকলাপ আমরা বিশেষরূপে জানিতে অক্ষম। আমি যে লোকের জীবনী সংক্ষেপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি একজন বিখ্যাত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, বিদ্যোৎসাহী, ইতিহাসলেখক, স্বদেশহিতৈষী, উপন্যাসলেখক, চরিত্রবান্ এবং প্রতিভাশালী লোক, তাঁহার নাম শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত। কলিকাতা রামবাগানে প্রসিদ্ধ দত্তবংশে ১৩ই অগষ্ট, ইং ১৮৪৮ সালে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। রসময় দত্ত, হরিশ্চন্দ্র দত্ত এবং পিতাম্বর দত্ত তিন ভ্রাতা ছিলেন। কনিষ্ঠ পীতাম্বর দত্তের পুত্র ঈশানচন্দ্র দত্তের তিন পুত্র এবং তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেশচন্দ্র দত্ত,

মধ্যম পুত্র রমেশচন্দ্র দত্ত এবং কনিষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র দত্ত। ঈশান-বাবু সরভে ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। বীরভূম, কুমারখালী, ভাগলপুর, বহরমপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়াছিলেন। রমেশবাবুর বাল্যকালের কতক সময় ঐ সকল স্থানে অতিবাহিত হইয়াছিল। ঈশানবাবু যখন খুলনার ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন, একদিবস সরকারী কার্য্য অনুরোধে নৌকা করিয়া কোন স্থানে তদাবক করিতে গিয়াছিলেন, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে ঝড়ে নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর মাত্র। ঈশানবাবু একজন কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র, যোগ্য রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। সরকারি কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। তিনি সৎকুলোদ্ভবা, সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও গুণসম্পন্না নারী ছিলেন।

শৈশবকালে পিতৃমাতৃহীন হইলে, তিন ভ্রাতা কলিকাতায় খুল্লতাত ৺শশিচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেথাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। শশিবাবু একজন বিদ্বান, বিজ্ঞ, সচ্চরিত্র, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বেঙ্গল আপিষে একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। শশিবাবুর পত্নী এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি নিজপুত্রের ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের তত্ত্বাবধান এবং বিদ্যা-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। শশিবাবু আপনি যেমন বিদ্বান ছিলেন, তেমনি তাঁহার নিজ পুত্রকে এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। যখন সময় পাইতেন তাহাদিগকে পড়াইতেন এবং মধ্যে মধ্যে লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করিতেন। ঈশানবাবু যে অর্থ

রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্তানগণের ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় যথেষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগকে তজ্জন্য কোন লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় নাই। শৈশবকালে রমেশবাবু কিছুদিন রামবাগানের বাঙ্গালা পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, ৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হেয়ার ইস্কুলে (Hare School) পড়িতে যান। মধ্যে মধ্যে তাঁহার পিতার সহিত বিদেশে যাইয়া কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। লেখাপড়ায় তাঁহার অতিশয় যত্ন ছিল। তিনি নিজ বাটী হইতে প্রায় বহির্গত হইতেন না। সর্ব্বদা পাঠগৃহে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত, তিনি গৃহে বসিয়া সাহিত্যবিষয়ক অন্যান্য পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। ইং ১৮৬৪ সালে হেয়ার ইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৪৲ টাকা করিয়া দুই বৎসর ছাত্রবৃত্তি পান এবং ইস্কুলের সকল ছাত্র মধ্যে তিনি প্রথম হইয়াছিলেন। তৎপরে ইং ১৮৬৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ (Preisdency College) হইতে ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর কাল ৩২৲ টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি পান। এই পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র মধ্যে দ্বিতীয় হন। যখন তিনি হেয়ার ইস্কুলে অধ্যয়ন করেন, তখন সহাধ্যায়ী বিহারীলাল গুপ্তের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মে।

১৮৬৪ সালে ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিবাহ হয়। রমেশবাবু উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৩ মার্চ্চ ১৮৬৮ সালে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত একত্রে সিভিল সারভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। অর্থের অনাটন ছিল না, কারণ তাঁহার পিতা মৃত্যুকালীন যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ লইয়া বিলাতযাত্রা ও সেস্থানের লেখা

পড়ার খরচ নির্ব্বাহ করিতেন। এক বৎসরকাল বিলাতে অবস্থিতি করিয়া দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে পাঠ করিয়া ১৮৬৯ সালে সিবিল সারভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিন শতের অধিক ইংরাজ ছাত্র-দিগের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এবং ইংরাজী সাহিত্যে একজন ব্যতীত সমুদায় ইংরাজ ছাত্রদিগকে পরাস্ত করিয়া-ছিলেন। ইহা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে; কারণ ইংরাজী তাঁহার মাতৃভাষা নহে। সেই বৎসর মিডিল টেম্পেলে (Middle Temple) অধ্যয়ন করিয়া ব্যারিষ্টার হইলেন, তাহার পর দুই বৎসর কাল স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইটজারল্যাণ্ড, ইটালি প্রভৃতি ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং রামবাগানে পৈতৃক বাটীতে ভ্রাতাদিগের সহিত কিছুদিন একত্রে বাস করিয়াছিলেন।

১৮৭১ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ২৪ পরগণায় আলিপুরের আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইলেন। তথায় এক বৎসর থাকিয়া ৭ই নবেম্বর ১৮৭২ সালে মুরশিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হন। তথায় অল্পকাল থাকিয়া ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ সালে নদীয়া জেলায় বনগ্রাম মহকুমায় বদলি হন। তাঁহার সময় বনগ্রামের কতক উন্নতি হইয়াছিল। নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, ভগ্ন ইস্কুল-গৃহ সংস্করণ, সময় সময় ইস্কুল ও পাঠশালা পরিদর্শন এবং ছাত্রদিগকে উৎসাহ প্রদান, সূক্ষ্মরূপে বিচারকার্য্য সম্পাদন করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। তথাকার ভগ্ন ইস্কুলগৃহ নির্ম্মাণের সময় তিনি দেড় শত টাকা দান করিয়াছিলেন। কোন কোন দরিদ্র বালককে অর্থ দিয়া ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইতেন। এবং স্বামীপুত্রহীন নিরা-শ্রয়া দরিদ্র বিধবা রমণীদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন। ১৮৭৪ সালে

৮ই মে তারিখে তিনি নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বদলি হন। সেই সময় নদীয়া জেলার পশ্চিম প্রদেশে বিখ্যাত পলাশির যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সন্নিহিত স্থানে অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছিল। নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্লাবিত এবং শস্য সকল নষ্ট হইয়াছিল। কত নরনারী অন্নাভাবে শীর্ণ কলেবরে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। কাহারও বা দিনান্তে অন্ন জুটিত না। শিশুসন্তানগণ মাতৃস্তনে দুগ্ধাভাবে হতশ্রী হইয়াছিল ও দিবারাত্র ক্রন্দন করিত। কোন কোন লোক উদরান্নাভাবে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিত। কত লোক রোগ শোকে, উদরান্নাভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই ভয়ানক অন্নকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি স্থানে স্থানে অন্নছত্র খুলিয়া অসংখ্য লোকদিগকে প্রত্যহ আহার দিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কার্য্য-ক্ষম লোকদিগকে রাস্তানির্ম্মাণের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে অশ্বারোহণপূর্ব্বক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থান সকল পরিদর্শন ও লোকদিগের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে সকল অন্তঃপুরনিবাসিনী দরিদ্র মহিলাগণ প্রকাশ্য স্থানে আসিতে সঙ্কুচিত হইতেন তাঁহাদিগকে চাউল ও পয়সা পাঠাইয়া দিতেন। এই হিত-কর, পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য তিনি দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার সুবন্দোবস্তে অচিরকাল মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপশম হইয়া-ছিল এবং তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইলে তিনি ১০ই নবেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে পুনর্ব্বার বনগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। এক সময় বনগ্রাম এলাকার কোন জমীদার জমির খাজনা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিয়াছিল। প্রজারা বর্দ্ধিতহারে খাজনা দিতে অস্বীকার করায় সেই সূত্রে জমীদার ও প্রজাদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। প্রজারা জমীদারের নামে ফৌজদারি আদালতে

নালিশ করে, তিনি উভয় পক্ষের লোকদিগকে ডাকাইয়া তাহাদিগের সম্মতিক্রমে জমির খাজনা নির্দ্ধারিত করিয়া আপোষে মোকদ্দমা মিটা-ইয়া দিলেন। ৩১শে অগষ্ট ১৮৭৬ সালে নদীয়া জেলায় একটীং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথায় তিন মাস থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে নদীয়া জেলার যে যে স্থানে নীলকরদিগের কুঠী ছিল, তথায় অত্যাচার হইত, নীলকরেরা বলপূর্ব্বক প্রজাদিগের জমিতে নীলবীজ বপন করিত। যদ্যপি কোন প্রজা তাহাতে আপত্তি করিত তাহা হইলে তাহাকে যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিত। বাস্তবিক নীল-করেরা তথাকার প্রভু ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমাগুলি তাহারা নিজে বিচার করিত। যে সকল লোক তাহাদিগের কথা অমান্য করিত এবং তাহাদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিত, উপায়হীন হইয়া তাহারা নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইত। ঈশ্বর ইচ্ছায় এবং গবর্ণমেণ্টের শাসনে সেই সকল অত্যাচার এক্ষণে নিবারিত হইয়াছে। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য প্রায় এক্ষণে শ্রুতিগোচর হয় না। নদীয়া জেলার রায়তদিগের অবস্থা এক্ষণে অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। নদীয়াজেলায় নীলকরদিগের পুরাতন ভগ্নকুঠী সমুদায় দেখিয়া স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নীল-দর্পণ পুস্তক এবং প্রজাহিতৈষী রেভারেণ্ড লং সাহেবের কারাবাস স্মরণ হয়।

সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালার ছোটলাট ছিলেন, সেই সময় প্রাইমেরী শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়, রমেশবাবু উক্ত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বনগ্রামে অবস্থান কালে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার অনুমতি

দিয়া নিরক্ষর লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। যখন তিনি মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইতেন সেই সময় পাঠশালা পরিদর্শন, ছাত্রদিগকে উৎসাহ ও পারিতোষিক দান, গুরুমহাশয়দিগের কার্য্য দেখিয়া বেতন বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি কার্য্য দ্বারায় গ্রামবাসী ইতর সাধারণ লোকদিগকে বিদ্যার পথে অগ্রসর করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা রিভিউ নামক ইংরাজি পত্রিকায় কখন কখন প্রবন্ধ লিখিতেন এবং বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা করিতেন। তিনি যখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন, এবং তথায় তিন বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে যে সকল পত্র ইংরাজীতে লিখিয়াছিলেন, সেই সকল পত্র একত্র এবং কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া পুস্তকাকারে ইউরোপের তিন বৎসর নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে বিলাতের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। ইহাতে যে সকল ক্ষুদ্র কবিতা আছে তাহা অতি সুন্দর ও ভাবপ্রকাশক। তাঁহার ইংরাজীতে কবিতা লেখা এই প্রথম [illegible]। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ সালে এই পুস্তক ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করা হয়, ইহার দুই একটী কবিতা আমি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলাম। অল্প সময় মধ্যে এই পুস্তক সকল বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। এই বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে বিলাতের বিষয় অনেক অবগত হওয়া যায় বলিয়া অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত এই পুস্তক আগ্রহের সহিত পাঠ করিত।

বনগ্রামে অবস্থিতির সময়ে রমেশবাবু বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক রায় বঙ্কিমচন্দ্রের

সহিত রমেশবাবুর বাল্যকাল হইতেই আলাপ ছিল, এবং বঙ্কিম বাবুরই পরামর্শানুসারে ও দৃষ্টান্ত দেখিয়া রমেশবাবু প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুতে আমরা একজন কৃতবিদ্য সুলেখক হারাইয়াছি। আমরা আশা করি রমেশবাবু তাঁহার স্থান পূরণ করিবেন। এবং বাঙ্গালা ভাষায় আরও পুস্তক লিখিয়া ভাষার উন্নতি ও দেশের উপকার করিবেন। বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"এই শতাব্দীতে বঙ্গদেশে অনেক জন বিখ্যাত লেখক আবির্ভূত হইয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে দুইজন প্রধান ও শ্রেষ্ঠ,—পদ্যে মধুসূদন, গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা ও ধীশক্তির কথা আজ লিখিতেছি না ; বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গদেশকে তিনি যেরূপ সমুন্নত করিয়া গিয়াছেন, সে কথা লিখিতেছি না ; বঙ্গবাসীকে যে মহৎ শিক্ষা, উদ্যম ও গৌরব দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা লিখিতেছি না। যিনি বঙ্কিমবাবুর জীবনী লিখিবেন, তিনি এ সমস্ত কথার আলোচনা করিবেন, গত ৩০ বৎসরের বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস বঙ্কিম ময়, তাহা তিনি প্রকটিত করিবেন।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্য কি ছিল? খ্যাতনামা ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার বঙ্গীয় গদ্য সৃষ্টি করেন, কিন্তু সীতার বনবাস ও চারুপাঠ বিদ্যালয়ে পঠিত হইত, আমাদের মেয়েরা পাঠ করিত,—শিক্ষিত যুবকের জীবন ও চেষ্টা, উদ্যম ও স্পর্দ্ধা ঐ পুস্তকের দ্বারা কত দূর গঠিত ও প্রতিফলিত হইত? ঈশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহনের কবিতা সরল ও সুমিষ্ট, কিন্তু জাতীয় জীবন ও জাতীয় উদ্যম, আশা, ও উৎসাহ সে কাব্যে কত দূর প্রতিফলিত হইত?

৩০ বৎসর হইল দুর্গেশনন্দিনী প্রচারিত হইল! তাহার পর কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধাবলী, প্রচারের প্রবন্ধাবলী, ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র,—আর কত নাম করিব? তীব্রগামী পর্ব্বত-নদীর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের

প্রতিভা ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বজ্রনাদে বহিয়াছে,—বঙ্গবাসীদিগের হৃদয় উত্তেজিত করিয়াছে, জাতীয় জীবন-চেষ্টা, জাতীয় ভাব ও কল্পনা ও ধর্ম্ম-পিপাসা প্রতিফলিত করিয়াছে,—জাতীয় শরীর গঠিত ও বলিষ্ঠ করিয়াছে! অদ্য আমরা বঙ্গসাহিত্যের স্পর্দ্ধা করি, যে সেটী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও জীবন-ব্যাপিনী চেষ্টার ফল!

কিন্তু এ সমস্ত কথা লিখিবার সময় এখনও হয় নাই। এ কথা আজ আমি লিখিতেছি না। বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন আমার মাননীয় বন্ধু ছিলেন,—বন্ধু সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিতেছি।

যখন আমার ১০।১২ বৎসর মাত্র বয়স ছিল, তখন আমার পিতা এবং বঙ্কিমবাবু একত্র খুলনায় কাজ করিতেন, উভয়েই ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন, উভয়ের মধ্যে অতিশয় স্নেহ ছিল। আমার পিতার রাজকার্য্য হইতে অবসর লইবার সময় হইয়া আসিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্যে তখন প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং বঙ্কিমবাবু আমার পিতাকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিতেন, এবং তাঁহার ঋষিতুল্য আদর্শ-চরিত্র লক্ষ্য করিয়া বড় ভালবাসিতেন। তখন একবার বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় আইসেন, আমাদের বাটীতে আমার পিতার সহিত একত্র আহার করেন,—সেই আমি বঙ্কিমবাবুকে প্রথম দেখিলাম! আমি তখন ১০।১২ বৎসরের বালক, বঙ্কিমবাবু আমাকে অতিশয় স্নেহ কবিলেন,—সে স্নেহ তিনি আজীবন ভুলেন নাই।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য্য উপলক্ষে খুলনা জেলায় আমার পিতার কাল হয়, বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] খুলনায় তিনি যেরূপ বিলাপ করিয়া একখানি পত্র লেখেন, অদ্যাবধি সে কথা আমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে। * *

তাহার দশ বৎসর পরের কথা বলি। বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান যশস্বী লেখক হইয়াছিলেন,—আমি বিলাত হইতে ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে প্রত্যাগত হইয়া আলিপুরে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

ভবানীপুরে একটী ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বঙ্কিমবাবু সর্ব্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল, বলা বাহুল্য বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা

করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লিখ না কেন? আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম,—আমি যে বাঙ্গালা লিখা কিছুই জানি না। ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনা-পদ্ধতি জানি না। গম্ভীরস্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন,—রচনা পদ্ধতি আবার কি,—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে। এই মহৎ কথা আমার মনে বরাবর জাগরিত রহিল,—তাহার তিন বৎসর পর আমার বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উদ্যম "বঙ্গবিজেতা" প্রকাশ করিলাম। * *

তাহার ১০।১৫ বৎসর পরের কথা বলি। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে যখন আমি রাজ-কার্য্য হইতে দুই বৎসরের অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পণ্ডিতগণের সাহায্য লইয়া ঋগ্বেদ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন একটা বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সে কথা অনেকেই জানেন। উন্নতমনা, সাহসী, উদারচেতা বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে সে সময়ে যেরূপ উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তাহা আমি জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। চারিদিকে অপবাদ, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া "প্রচার" নামক কাগজে বঙ্কিমবাবু আমার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন। তাঁহার উৎসাহ বাক্য আমি ঋগ্বেদের এক খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়া আপনার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিলাম। * *

তাহার পর প্রায় আর দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমি যখন যে উদ্যমে লিপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমি বঙ্কিমবাবুর নিকটে উৎসাহ পাইয়াছি। ইংরাজী ভাষায় আমি যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে ইতিহাস লিখিয়াছি, সেটী দেখিয়া বঙ্কিমবাবু আনন্দিত হইলেন। হিন্দুশাস্ত্রের সার অংশ যখন খণ্ডে খণ্ডে প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হইলাম, উদারচেতা বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে উৎসাহ দান করি-লেন, সে কার্য্যে নিজে সহায়তা করিতে ব্রতী হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বদিন আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন প্রায় অজ্ঞান, কিন্তু আমার গলার শব্দ বুঝিতে পারিলেন,—আমার দিকে চাহিয়া

সস্নেহে আমার সহিত কথা কহিলেন,—আমার একখানি ফটোগ্রাফ্ চাহিলেন। সে সময়ে কেন আমার ফটোগ্রাফ্ চাহিলেন, জানি না।

তাহার পর দিন শুনিলাম, যিনি ৩০ বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে রাজা স্বরূপ ছিলেন,—আজীবন আমার বন্ধু স্বরূপ ছিলেন,—তিনি আর নাই। বঙ্কিম-চন্দ্রের মৃত্যুতে আজি বঙ্গবাসী মাত্র আকুল,—তাঁহার বন্ধুদিগের হৃদয়ের শোক প্রকাশের সময় এখন নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও মহত্ত্ব সকলেই জানেন; তাঁহার হৃদয়ের সদ্‌গুণগুলি অল্প লোকেই বিশেষ করিয়া জানেন।"

এই সময়ে রমেশবাবু ইংরাজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়া বেঙ্গল মেকাজিন ও মুখর্জী মেকাজিন নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। পরে সেই প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া Peasantry of Bengal এবং Literature of Bengal নামক দুই খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার কল্পনা শক্তি ও কবিতা লিখিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সরকারি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় কবিতা রচনা করিবার সময় অতিশয় অল্প। বর্ষাকালে গভীর নিশীথ সময়ে যখন সকলে নিদ্রায় অভিভূত, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মুষল ধারায় বৃষ্টি পতিত হইতেছে, সৌদামিনী মেঘের কোলে খেলিতেছে, ঘন নিবিড় মেঘদল আকাশে গর্জ্জন করিতেছে, রমেশবাবুর চক্ষে নিদ্রা নাই, তিনি সেই সময় একাকী কল্পনার আবেশে গৃহ প্রকোষ্ঠে শনৈঃ শনৈঃ পদ চালন পূর্ব্বক ইংরাজীতে কবিতা রচনা করিতেছেন এরূপ আমি দেখিয়াছি।

রমেশবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট হইতে একটী কবিতা পাইয়া তাহার উত্তরে ইংরাজীতে যে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

১

সংসারে স্নেহের লতা তনয়া আমার
স্নেহে আঁকা মধু মাথা আনন তোমার
স্নেহ কোমলতাময়
তোমার নয়নদ্বয়,
শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম সৌন্দর্য্য তোমার
ভেবেছ কি পিতৃতরে
গভীর আশার ভরে
সুখের কামনা হেন মনে অনিবার
পিতৃতরে ফেলেছ কি নয়ন আসার

২

ধন্যবাদ করি তোরে স্নেহের পুতলি
পত্রে পাঠায়েছ যেই মধুর কাকলী
অপহরি শ্রান্তি ঘোর
মুছাইলে স্বেদ মোর
সংসারের করমের যাতনা ভুলালি
মধুর বদন যেন
মোহিল আমার মন
কষ্টের দিবস পুনঃ আনন্দে পুরালি
পরম উৎসাহে হায় আবার মাতালি

৩

সংসারের শস্য ক্ষেত্রে আমি রে কৃষক
শস্য হেরে সুখ পাই
অন্য সুখ নাহি চাই
গাইরে মনের সুখে যেমন চাতক
স্নেহ কাস্তে করে ধরি
শস্য অঙ্গে চোপ মারি
বিধাতা শাসন সুখে পালি রে যতেক
যদিও হয় কখন
অবসন্ন তনু মন
তোমাদের স্নেহ ভাবি আনন্দদায়ক
নবীন উৎসাহে মাতি যেন রে বালক

৪

যে আশা কুসুমহার যৌবন-কাননে
ফুটিয়া মোহিয়াছিল নবীন জীবনে
প্রণয়ের উৎস বারি
আনন্দের যে লহরী
ঢালি তৃপ্ত করে ছিল হায়রে জীবনে
যদিও শুকায়ে গেছে
শূন্য হিয়া পড়ে আছে
চাহি না ভ্রমিতে আর তেমন উদ্যানে
কর্ম্মি আমি সংসারের কঠোর কাননে

৫

কে পাঠাল মোরে এই স্নেহের কামনা
প্রশংসা প্রণয় মাথা কবির কল্পনা
স্বর্গের কি দূত তুমি
কন্যা স্নেহ বাসভূমি
অথবা প্রাণের বন্ধু বলিতে পারি না
কিন্তু তব স্নেহ ইন্দু
মুছাইল স্বেদবিন্দু
দূরিল পরম ক্লান্তি ঘুচাল যাতনা
সঞ্চারিল শক্তি দেহে ভুলিনু ভাবনা

সংসারে স্নেহের লতা তনয়া আমার
নির্ম্মল আনন নম্র নয়ন তোমার
তোমার জীবন যেন
না হয় কঠোর হেন
হয় যেন স্নিগ্ধসুখ সৌভাগ্য আধার
কিছু দিন গত হলে
ভেব সেই কৃষকেরে
কঠিন কাস্তের পরে দিয়ে যেই ভার
করেছিল আশীর্ব্বাদ প্রিয় তনয়ার।

১৮৭৬ সালের ৩১ শে অক্টোবর দিবসে প্রবল ঝড় ও জলপ্লাবনে সমুদ্রকূলস্থ অনেক গ্রাম, নগর ও জেলা সমুদায় নষ্ট হইয়া অসংখ্য লোকের জীবননাশ হইয়াছিল। মেগনা নদীর মোহানার নিকট দক্ষিণ সাহাবাজপুর নামক স্থানে এই জলপ্লাবনে অনুমান চল্লিশ হাজার লোকের জীবননাশ হইয়াছিল। নদী ও সমুদ্রের জল প্রবল বায়ু সংযোগে ২০ বিশ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। তদ্দেশবাসী লোক-দিগের বাটীর চতুর্দ্দিকে সুপারি বৃক্ষ থাকায়, ভগ্ন গৃহের চাল ভাসিতে ভাসিতে উক্ত বৃক্ষ সমূহে আবদ্ধ হইয়া অনেক লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিল। মৃত্যু ছোট বড় বিচার করে না। বলিষ্ট সুস্থকায় অসংখ্য লোক জলমগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল অনেক দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতার নিকট নিরাপদে চালের উপর বসিয়া ভাসিয়া রহিয়াছে। কত রমণী প্রিয়তম শিশু সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত। কত বালক বালিকাগণ নদী তীরে ও গ্রাম মধ্যে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। জীবিত লোকদিগের কষ্টের পরিসীমা ছিলনা। তাহারা আশ্রয়হীন ও আত্মীয়স্বজন বিরহিত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার স্ত্রী ভাসিতে ভাসিতে একটী বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া সমস্ত রাত্রি সেই বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার চারিটী পুত্র দুইটী কন্যা ও দৌহিত্রগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। উক্ত ডেপুটী বাবু সত্বর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

রমেশবাবুকে যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সেই বিপদ-সঙ্কুল স্থানে কর্ম্ম করিতে মনোনীত করিলেন। তখন কলিকাতা হইতে খুলনার রেলপথ নির্ম্মাণ হয় নাই, সুতরাং তিনি সুন্দরবন মধ্য দিয়া বোটে করিয়া ছয় দিবসে বরিশালে পৌঁছিলেন। প্রাচীন কালে

সুন্দরবন মনোহর অট্টালিকায় সুশোভিত, জনাকীর্ণ স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইহার ভগ্নাংশ সকল অদ্যাবধি জঙ্গল মধ্যে কোন কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। কালের বিচিত্র পরিবর্ত্তনে সুন্দরবন জনশূন্য স্থান হইয়াছে। নরমাংস-লোলুপ হিংস্র ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বন্য জন্তু সকল নির্ব্বিরোধে এই স্থানে রাজত্ব করিতেছে।

বরিশাল সংবাদদাতা রমেশবাবুর বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম ;—

১৮৭৭ সনে তিনি ভোলায় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসেন। ১৮৮৩ সনে বাখরগঞ্জ জেলার মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নত হন। প্রায় দুই বৎসর তিনি এই জেলায় ছিলেন। পূর্ব্বে এই জেলায় ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক ছিল ; তাঁহার সময় অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি বদমাইস লোকদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন।

জমীদার ও প্রজাদিগের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন করিবার তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। নিম্ন-শ্রেণীর নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার তাঁহার যত্ন ছিল। মধ্যে মধ্যে পাঠশালা পরিদর্শন করিতেন ও ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিতেন।

বরিশাল হইতে কলিকাতা গমনের সোজা পথ না থাকায় লোকের অতিশয় কষ্ট হইত তিনি ফ্লুটিলা কোম্পানির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া বরিশাল ও খুলনার মধ্যে বাষ্পীয় পোত গমনাগমনের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বরিশালে টেলিগ্রাফ ছিল না তাঁহার চেষ্টায় ও উদ্যোগে জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে টেলিগ্রাফ লাইন বসাইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উহা সম্পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত এখানে ছিলেন না। বাণিজ্য ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য মৃত্তিকাপূর্ণ আবদ্ধ খাল সকল খনন করিয়া দেশের উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় গ্রামের মধ্যে অনেক নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ হইয়াছিল।

১৮৮৪ সালে যখন মিউনিসিপালিটির সভ্য নির্ব্বাচন হয়, তখন তিনি প্রত্যেক ওয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাচন কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বাখরগঞ্জ জেলা শাসনে তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

অবশেষে রমেশবাবু বাখরগঞ্জ জেলায় উপস্থিত হইলেন। এই জেলার লোকেরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীতে দেশ-লুণ্ঠন ও ডাকাতি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। ঢাকা ও পশ্চিম বাঙ্গালাব লোক সকল তাহাদিগকে ভয় করিত, কারণ তাহারা তাহাদিগের পণ্য-দ্রব্য সময় সময় লুণ্ঠন করিত। এক্ষণে ইংরাজদিগের কঠোর শাসনে তাহা-দিগের দৌরাত্ম্য অনেক নিবারণ হইয়াছে বটে, কিন্তু সময় সময় তাহারা রাগ বা প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া পরস্পরে লাঠালাঠি, মারামারি ও কাটাকাটি করে।

ইং ১৮৭৬ সালের নবেম্বর মাসে রমেশবাবু দক্ষিণ সাহাবাজপুরে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহা কখন বিস্মৃত হইবার নয়। ইহা যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল, অনেক স্থানে লোকের আবাস গৃহের চিহ্ন মাত্র ছিলনা। লোকে বৃক্ষ তলায় বা সামান্য ছাউনি করিয়া কষ্টে দিনপাত করিত। কত পরিবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। কেহ বা ভ্রাতা, ভগ্নী, সন্তান, ও আত্মীয়স্বজন হারাইয়াছিল। তাহাদিগের গৃহে ক্রন্দনের ধ্বনিও শুনা যাইত না, যেন এই দেশব্যাপী ভয়ঙ্কর বিপদে সকলের হৃদয় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। স্থানে স্থানে মৃতদেহ পতিত ছিল। বৃক্ষের উপরে, জলাশয়ে, মাঠে, নৌকার চারিপার্শ্বে মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হইত। কোথায় বা কুক্কুর শৃগালগণ শবদেহ ভক্ষণ করিতেছে। এরূপ রাশি ২ মৃতদেহ দাহ বা প্রোথিত করা অসাধ্য। লোকে নিজ নিজ গৃহ নির্ম্মাণ ও খাদ্য সামগ্রী আহরণ কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিত। কেহ বা আপন ২ অলঙ্কার ও গৃহ সামগ্রী অন্বেষণ করিয়া বেড়াইত। জলের স্রোতে ফৌজদারি আদালত গৃহ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। কত পুলিষ কর্ম্মচারী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল। গ্রাম্য চৌকিদারগণ

কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং সকল কর্ম্ম একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

লোকের তৈজস পাত্র, গহনা ও বাক্স সকল জলের স্রোতে এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়াতে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে লোকে যাহা পাইয়াছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, অনুসন্ধান করিয়া যদি কোন লোক জানিতে পারিত আপনার গহনা বা তৈজস পাত্রাদি অন্য লোকের বাটীতে আছে, তাহা হইলে উক্ত দ্রব্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তাহারা ফৌজদারিতে নালিশ করিত। এইরূপ অবস্থায় লোককে ফৌজদারাতে দণ্ড দেওয়া বিধেয় নহে। অবশেষে ইহা স্থির হইল, ঐ সকল প্রাপ্ত দ্রব্য তাহারা অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবে, এবং ঐ দ্রব্যের চতুর্থাংশের এক অংশ নিজে রাখিবে। আদালত হইতে এই প্রকার অসংখ্য মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইল, এবং এই প্রকার সুবন্দোবস্ত দ্বারায় দেশে বিবাদ মোচন হইল।

এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তির অব্যবহিত পরে অন্য প্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই ভয়ানক দুর্দ্দিনে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক মরিয়াছিল। পুরুষের সংখ্যা অধিক ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম হওয়ায় বিবাহের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। পুরুষেরা বিবাহ করিতে রমণী পাইত না, যে সকল স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর জীবিত ছিল তাহাদিগকে বিবাহ করিতে সকলেই আগ্রহপূর্ণ। সুতরাং বিবাহপ্রার্থী লোকদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইতে লাগিল। ভিন্ন দেশের পিতা মাতা ও তাহাদিগের দুহিতাগণকে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে বিবাহ দিতে ভয় পাইত।

এ সমস্ত ভিন্ন দক্ষিণ সাহাবাজপুর এক্ষণে একটী নূতন ও ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িল। মৃত পশু ও মানব দেহ পচিয়া জলবায়ু দূষিত হইয়া ভয়ানক মড়ক উপস্থিত হইল। বিসূচিকা রোগে অসংখ্য লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন গৃহ প্রায় জন-শূন্য হইয়াছিল। কেহ কেহ স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলায়ন করিতে লাগিল। দেশে মহামারী ও হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। গৃহস্থেরা বাটীর মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া অগ্নি সেবন করিত, কোন কার্য্য করিত না। গ্রাম্য চৌকিদারেরা পুলিষের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ঘরে বসিয়া থাকিত। রোগাক্রান্ত লোকদিগকে সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধ ব্যবস্থার জন্য অনেক নেটিভ ডাক্তার ঔষধ সহ তথায় প্রেরিত হইয়াছিল। তথাপি প্রায় বিংশতি সহস্র লোক বিসূচিকা রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি পতিত হইয়া দুর্গন্ধ তিরোহিত ও পানীয় জল পরিষ্কৃত হইলে, বিসূচিকা রোগ একবারে অদৃশ্য হইল।

ইং ১৮৭৭ সালে ১ জানুয়ারি দিবসে ইংলণ্ডের মহারাণী ভারতেশ্বরী হইবার ঘোষণা পত্র প্রচার হইলে রমেশবাবু অল্পদিনের জন্য বরিশালে আসিয়াছিলেন। তৎপরে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে প্রত্যাগমন করিয়া ইং ১৮৭৭ সালে পুনর্ব্বার তথায় এক বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজকার্য্য বিবরণ সকল সংগ্রহ করা কঠিন।

তবে সেই সময়ে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে যাঁহারা রমেশবাবুর কর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে এক জন আমাকে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত করিতেছি।—"জলপ্লাবনের পর এখানে ডাকাতি ও দস্যুতা বৃদ্ধি হয়। রাত্রিকালে দস্যুদল ঘরে

৩

প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি অপহরণ করিত। এক ব্যক্তির গৃহসামগ্রী ও অলঙ্কারাদি জলের স্রোতে ভাসাইয়া অপর লোকের বাটীতে লইয়া গিয়াছিল। অদ্য যে ধনী ছিল কল্য সে পথের ভিখারী, যে ভিখারী ছিল সে ধনী হইল। মৃত দেহ পচিয়া দুর্গন্ধ হওয়ায় মক্ষিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আহারীয় দ্রব্য বিনা আবরণে রাখা যাইত না। নমোশূদ্র জাতির অনেক পুরুষ জলপ্লাবনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদিগের পত্নী ও আত্মীয় স্বজন অনেক লোক একবারে নিঃসহায় হইয়া পড়ে। তাহাদিগের জন্য রমেশবাবু অন্নছত্র খুলিয়া আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ভোলা নামক স্থানে নূতন করিয়া মহকুমা স্থাপন করিলেন, নদীর ধারে বাঁধ বাঁধিলেন, পুষ্করিণী খনন, রাস্তা প্রস্তুত, বৃক্ষ রোপণ, গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা ভোলা একটী সুন্দর স্থান হইয়া উঠিল। যে পর্য্যন্ত বাটী প্রস্তুত না হইয়াছিল রমেশবাবু তাম্বুতে থাকিতেন, কাছারি তাম্বুতে হইত, আমলারা কয়েক জন তাম্বুর মধ্যে বাস করিত।

সেই ভয়ানক ওলাউঠার সময় কেবল তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম, সৎসাহস ও অমায়িক ভাবের দরুণ তিনি সকলকে বশীভূত ও সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আসিতে কাহারও বারণ ছিল না। যাহার যে কোন বিষয় বলিবার আবশ্যক হইত তাঁহার নিকট নির্ভয়ে বলিত। দিবসে তিনি আপিসের কার্য্য করিয়া বৈকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সকলকে লইয়া নানাপ্রকার গল্পে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত সময় সময় বলিতেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা ভদ্র লোকদিগের সহিত করিতেন। এক সময় তাঁহার কাছারির কোন আমলার স্ত্রী ও পুত্রগণের কঠিন পীড়া হইয়াছিল, অর্থাভাবে ভালরূপ চিকিৎসা হয়

নাই, সে বিষয় তাঁহাকে অবগত করাইলে তিনি উক্ত আমলাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।”

এইরূপে দেড় বৎসর রমেশবাবু দক্ষিণ সাহাবাজপুরে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। এই অস্বাস্থ্যকর সময়ে তিনি যে আপনকার স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়াছিলেন ইহা কেবল জগদীশ্বরের অনুগ্রহে। ১৮৭৭ সালের শীতকালে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হওয়ায় প্রজাদিগের অন্ন কষ্ট দূর হইল। ১৮৭৮ সালের এপ্রেল মাসে তিনি ঐ দ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। কিছু কাল অবসর লইবার পর তিনি ত্রিপুরা জেলায় বদলি হইলেন।

ত্রিপুরা জেলায় কমিল্লা প্রধান নগর। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই জেলায় হিন্দুরাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন ইহা অদ্যাবধি তাঁহাদিগের কীর্ত্তি ও নাম ঘোষণা করিতেছে। তৎপরে মুসলমানেরা ঐ দেশ অধিকার করে। তাহাদিগের হস্ত হইতে এই দেশ ইংরাজদিগের অধীনে আসিয়াছে। কিন্তু পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা অদ্যাবধি স্বাধীন আছে, আগড়তলা নামক স্থানে রাজার বাসস্থান। ত্রিপুরা জেলায় তিপুরা ও মণিপুরী জাতি অনেক লোক বাস করে। তাহারা রীতিমত কৃষিকার্য্য করে না, পাহাড়ের পার্শ্বদেশে গর্ত্ত করিয়া তথায় বীজ বপন করে। ইহাকে তাহারা “জুম” কহে। স্ত্রীলোকেরা জ্বালানি কাষ্ঠ ও মোট সকল ঝুড়িতে রাখিয়া রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া মস্তকে ঝোলাইয়া লইয়া যায়। তাহারা অতিশয় পরিশ্রমী।

ইংরাজাধিকৃত ত্রিপুরা জেলার মধ্যে লালমাই নামে একটী পর্ব্বত-শ্রেণী আছে। তদ্ভিন্ন সমস্ত দেশ সমতল ও উর্ব্বরা। এই স্থানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। শস্যক্ষেত্রসমূহে দৃষ্টিপাত করিলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। বর্ষাকালে জেলার অনেক স্থান জল-মগ্ন হয়।

ছয়মাস কাল ত্রিপুরায় কার্য্য করিয়া রমেশবাবু বর্দ্ধমান জেলার কাট্‌ওয়া মহকুমায় বদলি হয়েন, এবং তথায় বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া ইংরাজি ১৮৮০ সালে বাঁকুড়া জেলায় বদলি হয়েন। বাঁকুড়া মনোহর স্থান। ইহার পূর্ব্বভাগের ভূমি বর্দ্ধমান জেলার ন্যায় সমতল ও উর্ব্বরা, কিন্তু বাঁকুড়ার পশ্চিম ভাগ সুন্দর পর্ব্বত-সঙ্কুল, পর্ব্বত-নদী বিভূষিত এবং অনন্ত শালবন বিরাজিত।

বাঁকুড়া জেলায় বাউরী প্রভৃতি আদিম জাতির অনেক লোকের বাস আছে, এবং সেই সকল আদিম জাতির আচার ব্যবহার সমালোচনা করিলে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

বাউরী স্ত্রীলোকেরা অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মিষ্ঠ, তাহারা পুষ্করিণী খনন, পথ নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মুচি ও ডোম জাতির পুরোহিত আছে, কিন্তু বাউরীদিগের পুরোহিত নাই। তাহাদিগের বিবাহ-কার্য্য ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে মহাভোজ হইয়া থাকে। তাহারা পাঁচুই নামক একপ্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পান করে। বাঁকুড়া ও মানভূম জেলার বাউরী জাতিরা ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির সময় ভাদুই দেবীর পূজা অতি সমারোহে সম্পন্ন করে, এবং প্রতিমা ফুল দিয়া সাজাইয়া তাহার সম্মুখে নৃত্য করে ও গীত গায়। স্ত্রীলোক ও বালকগণ গ্রাম মধ্যে ও রাস্তায় রাস্তায় গান করিয়া বেড়ায়। তাহাদিগেব আনন্দ ধ্বনিতে দেশ পূর্ণ হয়। ভাদ্র মাসে নূতন ধান্য কর্ত্তন করিবার সময় তাহাদিগের এই পর্ব্ব হয়।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর নামক স্থানে পূর্ব্বে স্বাধীন রাজার রাজ্য ছিল। যদ্যপিও বিষ্ণুপুরের প্রাচীন দুর্গ এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত, তথাপি ইহার সুদৃঢ় সিংহ-দ্বার, সুন্দর দেব-মন্দির, বৃহৎ পরিখা

অদ্যাপি নয়ন পথে পতিত হইয়া ইহার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া দেয়। মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশ জয় হইবার পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজগণ স্বাধীনভাবে বাঙ্গালার পশ্চিম প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এই স্থান দামোদর, কশাই ও সিলাই নদী এবং নিবিড় জঙ্গল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় মুসলমান সুবাদারগণ এই স্থানে আসিত না। সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান ও বীরভূম এই দুই রাজবংশ আধিপত্য স্থাপন করিলে বাঙ্গালার সুবাদার তাঁহাদিগের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজা নিভৃত ও দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি হেতু সুবাদারকে নিয়মিতরূপে কর দিত না। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর খাঁ বীরভূমে মুসলমান রাজ্য প্রথম স্থাপন করেন এবং ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের কোতোয়াল আবু রায় বর্দ্ধমান রাজবংশ স্থাপন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীগণ বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করিয়া লোকদিগের উপর অত্যাচার ও রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল। সেই সময় বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচাঁদ বিষ্ণুপুরের অনেক স্থান স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ সনে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় বিষ্ণুপুরের রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানিকে রাজস্ব দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া যায়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেবর্দ্ধমানের মহারাজা অবশিষ্টাংশ ক্রয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে বিষ্ণুপুরের রাজবংশ রজপুত বংশ জাত। কোন সময়ে এক রজপুত রাণী পুরুষোত্তম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন বিষ্ণুপুরের জঙ্গল মধ্যে এক পুত্র প্রসব করিয়া সেই সদ্য জাত পুত্রকে বন মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। বাগ্দী জাতীয় কাশমেটিয়া নামক একজন কাঠুরিয়া ঐ শিশুকে একাকী

নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে লাগিল। বাগ্দীর আলয়ে ঐ শিশু সন্তান শশি-কলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন বিষ্ণুপুরের রাজার মৃত্যু হয় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর উক্ত রাজার হস্তী ঐ বলিষ্ঠ রজপুত বালককে শুণ্ডে উত্তোলন করিয়া শূন্য রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিল। এই বালক রঘুনাথ রায় নামে বিষ্ণুপুরের প্রথম রজপুত রাজা বলিয়া বিখ্যাত। রমেশবাবু বাঁকুড়া জেলায় দুই বৎসরের অধিক কাল ছিলেন। ১৮৮১ সালে কিছু কালের জন্য উক্ত জেলার শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, প্রথমে যখন তিনি বাঁকুড়া জেলায় জঃ মাজিষ্ট্রেট ছিলেন সেই সময় তাঁহাকে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব কার্য্য সকল ও ফৌজদারি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইত। এই সকল কার্য্যে তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যগুণে সকলে তাঁহাকে মান্য করিত ও ভাল বাসিত। মাজিষ্ট্রেট হইয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ও বিবেচনার সহিত সকল কার্য্য করিতেন। মফঃস্বলে ভ্রমণ কালীন সকল প্রকার লোকের সহিত মিশিতেন ও তাহাদিগের কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। যে কয়েক মাস তিনি মফঃস্বলে ছিলেন তাঁহার ডায়েরী পুস্তক আবশ্যকীয় নানাবিধ বিষয়ে পূর্ণ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ ক্ষমতা, শিষ্টাচার ও কার্য্য-কুশলতা একাধারে প্রায় দেখা যায় না কিন্তু রমেশ বাবুর এই সকল গুণ ছিল। ১৮৮২ সালে বর্দ্ধমান বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৩ সন হইতে ১৮৮৫ সন পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জ জেলায় কর্ম্ম করিয়া-ছিলেন, তিনি উক্ত জেলার ভারপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার উপর অনেক লোকের দৃষ্টি পতিত হইল। ইহার পূর্ব্বে তিনি ও তাঁহার স্বদেশবাসী দুই একজন লোক দুই এক মাসের জন্য কোন কোন জেলার

ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রমেশবাবু প্রথম দীর্ঘকালের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ জেলার ভারপ্রাপ্ত হন। কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছিল যে উক্ত কর্ম্ম ভারতবাসীর দ্বারা নির্ব্বাহ হইবেক না। অল্পকাল মধ্যে তাহাদিগের ঐ ভ্রম দূর হইল। বাখরগঞ্জ বাঙ্গালার মধ্যে একটী বৃহৎ জেলা ও এখানে কর্ম্ম অধিক। এখানকার অধিবাসীরা কলহ প্রিয় ও দুর্দ্দান্ত। তাহাদিগকে শাসনাধীনে আনয়ন করা বড় সহজ নহে। বিশেষতঃ এই সময়ে ইলবার্ট বিল লইয়া ঘোর আন্দোলন হইতেছিল, সেই কারণ জনসাধারণের মন বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়াছিল। সুখের বিষয় বলিতে হইবেক তৎকালীন এই স্থানে কোন প্রকার গোলমাল বা অশান্তি লক্ষিত হয় নাই, জেলার কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল।

স্বয়ং লেফটেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কলিকাতা গেজেটে রমেশবাবুর বাখরগঞ্জ জেলার শাসন কার্য্যের প্রশংসা করিলেন, এবং বাৎসরিক পুলিশ রিপোর্টে ও জেলার শান্তি রক্ষা সম্বন্ধে অনেক স্তুতিবাদ করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে তৎকালের গবর্ণর জেনেরল মহানুভব লর্ড রিপন রমেশবাবুর শাসন কার্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রমেশবাবু কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে সন্মানের সহিত আহ্বান করিয়া তাঁহার শাসন কার্য্যের অনেক স্তুতিবাদ করেন।

বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার ভূমি যেমন শুষ্ক ও উচ্চ, বাখরগঞ্জের ভূমি তদ্রূপ নহে, এখানে অনেক ক্ষুদ্র নদী আছে। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে নৌকা করিয়া যাইতে হয়। জোয়ারে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ ধৌত করিয়া লইয়া যায়। দক্ষিণ ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী একত্রে মিলিত হইয়া বৃহৎ নদীরূপে পরিণত

হইয়াছে। জেলার উত্তর সীমার নদীগুলি ক্ষুদ্র ও সুন্দর। নদী-তীরস্থ বৃক্ষ সকল নব পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। গ্রাম্য লোকদিগের বাসস্থান এই নিভৃত বৃক্ষাচ্ছাদিত স্থানে অবস্থিত এবং লোকেরা ক্ষুদ্র নৌকা করিয়া একস্থান হইতে অন্য-স্থানে গমনাগমন করে। তাহাদিগের বাটীর চতুঃপার্শ্বে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ, স্থানে স্থানে শ্যামল শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র।

বরিশাল জেলার ইস্কুলের বালক বালিকাগণ তাঁহাকে নিম্নলিখিত পদ্য উপহার প্রদান করিয়াছিল ;—

প্রথম উচ্ছ্বাস মঙ্গলাচরণ।

১

মনের আনন্দে বাজবে বাঁশরী
ঢাক্, ঢোল, শঙ্খ, সারঙ্গ, কাঁশরী,
বাজ্ পাখোয়াজ, বাজ্ বেণু, বীণা,
বাজ্‌রে মৃদঙ্গ, তাধিনা, তাধিনা।

২

গাও, সবে মিলি সুমঙ্গল গান ;
সুললিত স্বরে ধরি মৃদু তান্।
উড়াও, সকলে মঙ্গল কেতন,
ছিটাও. সর্ব্বত্র অগুরু চন্দন।

৩

সারি সারি রোপ', রম্ভাতরুগণ,
মঙ্গল কলসী করগো স্থাপন ;
কুসুম মুকুল, পল্লবের মালা,
তোরণ সকল করুক উজ্বলা।

৪

চল্ আগু হয়ে, হই অগ্রসর ;
পথ অবরোধ, ত্বরা সর্ সর্।
জয় হুলুধ্বনি, ত্বরা দেরে ধনী ;
সুকবি রমেশ, রাজ প্রতিনিধি,
দেখ্ সবে দেখ্, গৃহে প্রবেশিল।

দ্বিতীয় স্তবক।

১

এ ক্ষুদ্র পঠনালয়ে, তব আগমনে—
যে আনন্দ, কি বলিবে, অবোধ বালিকা।
ফোটে না আননে বাণী, বলিবে কেমনে ;
প্রকৃতি আবরে যেন ঘন কুহেলিকা।

২

ইচ্ছা হয় সবে মিলি দেই হুলুধ্বনি,
দুরু দুরু করি মন উঠেরে নাচিয়া ;
এমন আনন্দ আর জনমে জন্মেনি,
অভিলাষ নৃত্য করি, করতালি দিয়া,

৩

শুনি শিক্ষকের মুখে তুমি কবি-বর,
সে বঙ্গবিজেতা আদি কাব্য-চতুষ্টয়,
কল্পনার সুতুলিতে আঁকি মনোহর ;
রাখিলে জগতে যশ অতুল, অক্ষয়।

৪

না পেয়েছে বঙ্গবাসী যে পদ কখন,
বিহারী, সত্যেন্দ্রনাথ পেয়েছে যেমতি,
সেই আশাতীত-পদ করিলে গ্রহণ,
ঘোষিছে ইংলণ্ড তব প্রতিভা মহতী।

৫

সমস্বরে একতানে সকল বালিকা,
গাও সুমঙ্গল আজ আনন্দের দিন।
গাও সবে রমেশের সুযশোগীতিকা;
এজন্মে পাবি না, আর হেন শুভ দিন।

৬

ভারতের নারী মোরা পিঞ্জরে পশিব,
আর কিছুদিন পরে, বিহঙ্গিনী যথা,
আর কি স্বাধীন ভাবে বলিতে পারিব,
চির পরাধিনী নারী মরমের কথা?

৭

আমাদের মহারাণী, অবলা রমণী;
তাহাতে বাঙ্গালী তুমি প্রতিনিধি তাঁর,
বাঙ্গালী বালিকা মোরা চির পরাধিনী,
এদেরে কেননা দয়া, হইবে তোমার?

৮

অশিক্ষিতা বঙ্গবালা, যে দেশে সকলে,
রমণীর উচ্চ শিক্ষা গণিত, বিজ্ঞান,
জ্যোতিষের আলোচনা, দোষাবহ বলে,
সে ভারতে আমাদের চির বাসস্থান।

৯

আমাদের যে অভাব, বলিব কি হায়!
সহজে অবলা জাতি রসনা দুর্ব্বল;
প্রদর্শনে প্রতিনিধি! পাবে পরিচয়।
বিদ্যালয় সম্পর্কীয় অবস্থা সকল।

১০

রাস্তা, পোল, অভাবেতে চলিতে না পারি
অধিকাংশ বৃদ্ধতায় ঘটায় প্রমাদ,
নিঃসম্বল, "সম্মিলনী" কি করিবে তারি,
তবু প্রতিষ্ঠাত্রী বলে দেই ধন্যবাদ।

১১

অবোধ বালিকাগণ কি জানাবে আর?
সহজেই হীনবুদ্ধি, বঙ্গের রতন,
—ভারত ভূষণ।
ঈশ্বরের পাদপদ্মে প্রার্থনা সবার
করিবেন, তিনি তব মঙ্গল বর্দ্ধন॥

১৮৮৩। সেপ্টেম্বর

বিনয়াবনতা
ছাত্র "সম্মিলনী"র অন্তর্গত গৈলা বালিকা-
বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণ।

১

প্রভাতা কি শুভক্ষণে নিশিথিনী আজ
আনন্দ প্রতিভাপূর্ণ সবার বদন;
বৃক্ষ-শাখে বসি ঐ বিহঙ্গ সমাজ,
ধরিয়ে মধুর তান আনন্দে মগন।

২

আনন্দের দিন আজ, আনন্দে মগন
হইয়া করহ সবে, মঙ্গল সাধনা:
হউক আনন্দে ভোর গৈলাবাসিগণ;
উলুধ্বনি ঘরে ঘরে করুক ললনা।

৩

ভারত কবরী-রত্ন, ভারত-ভরসা,
আসিবে রমেশ এই পবিত্র আলয়ে,
সুখ রজনীর এই ভীষণ তমসা
হলে লুপ্ত; এ আনন্দ ধরে না হৃদয়ে।

৪

এ সহে সকলে মিলে সতৃষ্ণ নয়নে,
আশাপথ চেয়ে করি সময় যাপন,
ভারত-নলিন-ভানু রমেশের সনে,
মিশিব আমরা তার কর আয়োজন।

৫

রোপিয়া কদলী-তরু কলস স্থাপন
বারিপূর্ণ সারি সারি মালা বিভূষিত,
সহকার-শাখা সহ কুসুম চন্দন
সুনিয়মে তদুপরি করহ স্থাপিত।

৬

সাজাও গৃহের দ্বার পরম যতনে,
পূর্ণকুম্ভ সারি সারি রাখ স্তরে স্তরে,
বাজুক প্রত্যেক গৃহ মঙ্গল বাজনে ;
পুরবালা সুমঙ্গল করুক সাদরে।

৭

দরিদ্র আমরা আর করিতে কি পারি,
উপহার যোগ্য তাঁর, কি আছে এমন ?
চন্দন বাসিত পুষ্পমালা সারি সারি
গাঁথিয়া করিব তাহা শ্রীকরে অর্পণ।

৮

ভারত ঈশ্বরী যাঁরে অতি সমাদরে
বাঙ্গালীর আশাতীত প্রদানিল পদ,
নিরুপায় ছাত্রবৃন্দ তুষিতে তাঁহারে
কিবা আর পারে দিতে? কি আছে সম্পদ?

৯

অহো! রাজপ্রতিনিধে! আমরা সকলে,
যে উৎসাহে চেয়ে আছি আগমন পথ,
বলিতে সে কথা, নহে শত জিহ্বা হলে,
পারে কেহ ? হ'ল আজ পূর্ণ মনোরথ।

১০

সে "বঙ্গবিজেতা" কাব্য "মাধবী-কঙ্কন"
হইয়াছে যে কবির লেখনী-নিঃসৃত
প্রত্যক্ষে হেরিয়া তায় সফল নয়ন,
স্থিরভাব, অপলক, সতৃষ্ণ স্তিমিত।

১১

জিহ্বা কর্ণ সুখে করি গুণামৃত পান,
বর্ণিতে উন্মুখ তব মহিমা লহরী ;
কিন্তু যে হৃদয় হয় ভয়ে ম্রিয়মাণ,
স্মরিয়ে সে কবি-কীর্ত্তি কাঁপে থর থরি,

১২

যে কবির বর পুত্র "মালতী মাধব"
"রাম সীতা উপাখ্যান উত্তর চরিত"
যে কবির ; কিম্বা কাব্য "কুমার সম্ভব"
যাঁর ; যাঁর কাব্য-রত্ন "নৈষধ চরিত";—

১৩

সে সবার সম কীর্ত্তি লভিয়া ভারতে
নাশিতে জাতীয় ক্লেশ সচেষ্ট সতত,
অমেয় যদ্যপি তাহা, অণু কোনমতে
কমাইতে যদি পার ; হবে আর্য্যোচিত।

১৪

দুঃখিনী মাতার আর আছে কিবা ধন,
বিষের দহনে তার দেহ জর্জ্জরিত ;
তুমি তার ভাবী আশা তোমাতে নয়ন
পাতিয়া রয়েছে দেখ সমস্ত ভারত।

১৫

দেশের মঙ্গল-ভার তোমাতে অর্পিত,
তোমার বিহনে এবে ভারত মাতার
আছে বল কিবা ধন ? সব অস্তমিত
পূর্ব্বের গৌরব রবি ; এবে অন্ধকার।

১৬

ভারতের আশা-তরু তুমি হে রমেশ !
তবপানে চেয়ে আছে ভারত জননী—
তোমা রত্নে শিরে ধরে উজলিবে দেশ
আশা করে সব ভাই, কবি চূড়ামণি।

১৭

আমরা বালকগণ উপায় রহিত
সাধ্যহীন তোমা হেন জনে তুষিবার ;
কৃতার্থ হইব সবে হইলে গৃহীত
তোমার গৌরবাযোগ্য এই উপহার।

১৮

আয়াস স্বীকারি দিলে যেই দরশন
উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা করিতে স্বীকার
অক্ষম এ ছাত্রগণ ; তবুও স্মরণ
করিবে, হে দয়াময় ! প্রার্থনা সবার।

১৯

জগদীশ স্থানে করি প্রার্থনা নিয়ত,
কবিত্ব বর্ষণে কর ধরা মধুময় ;
উন্নতি করিয়ে কর মঙ্গল সতত
জননীর ; পুনঃ কর সুখের উদয়।

২০

জগদীশ ! প্রেমময় ! তোমার চরণে
করি প্রণিপাত নাথ ! পুরাও বাসনা ;
করহ মঙ্গল তাঁর ; তোমার সদনে
করি কায়মনে বিভো ! ইহাই প্রার্থনা।

২১

ভারত মাতার রত্ন, কবরী ভূষণ,
যে রত্নেতে উজলিবে ভারত-অধীনা ;
কাল-চোর সেই রত্ন না করে হরণ
করি কায়মনে বিভো ! ইহাই প্রার্থনা।

২২

অগাধ-জলধি-লক্ষ্য সেই ধ্রুব তারা
অথবা প্রদীপ প্রায় ; গৃহ যাহা বিনা
প্রগাঢ় তমসাবৃত ; কভু নই হারা,
করি কায়মনে বিভো ! ইহাই প্রার্থনা।

বিনয়াবনত
গৈলা স্কুলের ছাত্রগণ।

১

এস ভাগ্যবান বঙ্গের সন্তান
জগত গাইছে তব যশ গান
অশ্রু মুছি হাসে ভারত জননী
বঙ্গের রমণী করি জয় ধ্বনি
গাইছে তোমার মঙ্গল গাথা।

হৃদে কৃতজ্ঞতা অধরে সুহাসি
নিরখি তোমারে সুখী বঙ্গবাসী
সাধিয়া স্বকার্য্য লভ পুণ্যধন
বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র হৃদি সিংহাসন
তোমার লাগিয়ে রয়েছে পাতা।

২

ধন্য জন্ম তব জীবন সফল
তব যশে বঙ্গ হউক উজ্জ্বল
ভুবন ভরুক তব গুণ গানে
যোগ্য পাত্রে বিধি সুবিধি বিধানে
ধন জ্ঞান তোমা সকলই দিলা।

প্রাচীন ভারতী লক্ষ্মী সরস্বতী
করে না কদাপি একত্রে বসতি
চির বিসম্বাদ বুঝি পরিহরি
মিশিয়াছে আজ কি সুন্দর মরি
রমেশ হৃদয়ে বাণীর লীলা।

৩

বাঙ্গালী হৃদয় ইউরোপ প্রবাসে
প্রায়শ পরবশে বিলাতি বিলাসে
থাকে না সম্পর্ক স্বদেশের সনে
কালরূপ আর সহে না নয়নে
তাই মনে বড় আছিল ভয়।

কিন্তু তুমি সেই গর্ব্ব পরিহরি
করি স্বজাতির গলা ধরা ধরি
রাখিয়া সুন্দর স্বভাবের রীতি
দেখাইছ গুণ শিখাইছ নীতি।
ফল ভরে নত মানবও হয়।

৪

কি জানাব আজি কিনা জান তুমি
এই বঙ্গ তব প্রিয় জন্মভূমি
সপ্তকোটী এই শক্তিহীন দেহ
সঞ্জীবক মণি পরশিলে কেহ
জীবন সঞ্চরে এমত প্রাণে।

দয়া মায়া আদি প্রবৃত্তি নিচয
আজিও এদের ধমনীতে বয়
সাধিতে প্রস্তুত স্বদেশের হিত
শুনাইলে কেহ বীরের সঙ্গীত
এরাও সে গান গাইতে জানে।

৫

দেখ দেখ চাহি জগত মাঝারে
বিশ্রামের স্থান ছিল না যাহার
রাজ রাজেশ্বরী হইল আজি
অনুপম বস্ত্র আভরণে সাজি
জগতে সবারে দেখাল তাই।

আর বঙ্গমাতা কি বলিব আর
অনিবার বারি নয়নে মাতার
সদা শোকাকুলা ধূলায় শয়ন
আধখানি জীর্ণ মলিন বসন
এদিকে টানিলে ওদিকে নাই।

৬

যথা পক্ষীরাজ বিনতা তনয়
সাহসে পশিয়ে অমর আলয়
অপার আগ্রহে করি প্রাণপণ
আহরি অমৃত অমূল্য রতন
মাতার দাসীত্ব নাশিয়া ছিল।

অচির নিগ্রহ অনন্ত যাতনা
বিনাশিতে করি অসাধ্য সাধন।
সুর ভোগ্য সুধা দিয়া উপহার
কাটিয়া শৃঙ্খল দুঃখিনী মাতার
যতনে নয়ন মুছিয়া দিল।

৭

সেইরূপ তুমি যথা সাধ্য মতে
ভূলোক গোলোক শ্বেতদ্বীপ হতে
সাত সমুদ্রের তরঙ্গেতে ভাসি
আনিলা আহরি জ্ঞান সুধারাশি
রাখিলে সুযশ জগতী তলে।

আজি এ ভারতে সেই সুধাদানে,
জাগাও বাবের্ক সংখ্যাতীত প্রাণে
মৃত দেহে কর জীবের সঞ্চার
চির অনাথিনী ভারত মাতার
দাও গো মুছায়ে নয়ন জল।

৮

দুঃখিনী মাতার আদরের ধন
চির সুখে কর জীবন যাপন
চির হাসি তব বিরাজিত মুখে
রবে সদাকাল, রবে সদা সুখে
দেবতা তোমারে আশীষ দিলা।

করি স্বজাতীরে যতনে পালন
যশ সহ পুণ্য কর উপার্জ্জন।

হৃদয়ের প্রীতি জানাব আর কি
দেখি সুখী যেন সদাকাল থাকি
রমেশ হৃদয়ে বাণীর লীলা।

গাও হে পঞ্চমে গাও হে স্বদেশ
গাও সুমধুরে ধরিয়া তান।
গাও উচ্চরবে নর নারী যত,
ভারত রতন রমেশ নাম॥

গাবে প্রতিধ্বনি গহন কাননে,
অনন্ত আকাশে পূরিবে রব।
ভেদি অন্তস্থল মধুর নিক্কণে,
নাচিবে উল্লাসে মাতিয়া সব॥

ত্যজি শয্যাতল উঠরে জাগিয়া
হরষে সরসে স্বদেশবাসী।
গাও সপ্তস্বরে বীণা বাজাইয়া
বেহাগ মল্লারে জুড়িয়া তান॥

গগণ পরশি কণ্ঠ মিলাইয়া,
গাও সমস্বরে যতেক নরে।
দয়ার আধার করুণা নিদান,
ভকত বৎসল রমেশ বরে॥

গাও জয় জয় রমেশের জয়,
জয় ভারতের অমূল্য নিধি।
ভারতের যিনি মঙ্গল আলয়,
ভারতের যিনি ভরসা এবে।

গাও জয় জয় ভারতের তরে,
অপার জলধি হইয়া পার।
বিজাতি নিবাস বৃটন নগরে,
মাতৃভূমি ছাড়ি ছিলেন যিনি॥

পূবরে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে,
জয় জয় রবে গাওরে সবে।

মাতুক সবাই সে রব শ্রবণে;
ফুলুক হৃদয় হরষাবেশে॥

গাওরে আবার গাওরে সবাই,
গাও সুমধুর ধরিয়া তান।
গাও উচ্চরবে অনন্ত আকাশ,
ভারত রতন রমেশ নাম॥

শুভাগমে যাঁর উৎসবে মাতিয়া,
উঠিল আজি এ সমগ্র দেশ।
গাবে এক মনে সুযশ তাঁহার,
প্রাতঃ সন্ধ্যাভরি মিলিয়া সবে॥

দুঃখিনী বঙ্গের অদৃষ্ট আকাশে
উদিলেক এবে রমেশ রবি।
চির অন্ধকার বঙ্গ নিকেতনে;
হাসিল রে আজ কিরণজালে॥

পোহাল আজি মা দুঃখের রজনী,
রমেশ তোমার কোলেতে এল।
যত অশ্রুজল এবার তোমার,
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল॥

ত্যজি শয্যাতল উঠ মা জাগিয়া,
কুটীর ছাড়িয়া দেখ মা আসি,
তব জেতৃগণ উৎসবে মাতিয়া:
কি আনন্দে হায় ভাসিছে আজি,

এসেছে জননী রমেশ কুমার,
বহুদিন পরে তোমার ভূমে।
ধর কোলে কর তনয় রতন;
আচ্ছন্ন হও না শোকের ধূমে॥

কহ ধীরি ধীরি সম্ভাষি তনয়ে,
তোমার অদৃষ্ট ঘটনা যত।
দেখাও চিরিয়া ক্ষত বক্ষঃস্থল;
যে শোক তোমার হৃদয়ে জাগে॥

রিপু পদ চিহ্ন হৃদয়ে অঙ্কিত
তাই এত কষ্ট বুঝি মা তব।
দুঃখিনীর বেশ এবার তোমার;
ঘুচাবে সকলি রমেশ সুত॥

ধন্য ধন্য তুমি ধন্য গর্ভ তব,
যে সুতে আজি মা কোলেতে পেলে
ধন্য পুত্র সেই, যে জন ধরায়;
মাতৃ দুঃখ দূর করিতে পারে॥

সেই পুত্র আজ রমেশ তোমার,
কি ভয় এখন উঠ মা জীয়ে।
কেন্দ না জননী মুছ অশ্রু জল;
সাদরে কুমারে কোলেতে নিয়ে॥

ধন্য জন্মভূমি ধন্য আর্য্য সুত,
ধন্য বঙ্গ দেশ ধন্য রে সকল।
ধন্য ধন্য এবে হইল রে হায়;
রমেশ পরশে আজি এ দেশ॥

ভক্তি পুষ্প সবে নিয়ে করতলে,
সাজাও রমেশে হরিষ মনে।
রাজ ভক্তি চিহ্ন দেখাও তাঁহারে;
সসম্ভ্রমে সবে নোয়ায়ে মাথা।

জানাও যতনে যতেক মানব,
স্বজাতি প্রণয় প্রবল প্রবাহ
কেমনে আজিকে জাতীয় হৃদয়ে;
অনিবার্য্য বেগে ধাইছে হায়॥

দেখুক স্বর্গেতে দেবতা নিচয়,
কি আনন্দ আজ বাঙ্গালির মনে।
সুগভীর রবে গাও জয় জয়;
জয় বঙ্গমাতা রমেশ জয়॥

গভীর আনন্দে মাতুক মেদিনী
মাতুক হরষে পর্ব্বত কানন।
গাউক জলধি গভীর গর্জ্জনে
নাচুক উল্লাসে রাণীর হিয়া॥

জানুন জননী ইংলণ্ডে বসিয়া
বাঙ্গালির আজ আনন্দের দিন।
তাই মুহুর্মুহুঃ গাইছে গভীরে
জয় বঙ্গমাতা রমেশ জয়॥

তোমার কৃপায় ভারত ঈশ্বরী,
দুঃখিনী বঙ্গে এসেছে রমেশ।
রাজকীয় পদ দিলে দয়া করি;
আনন্দের তেঁই নাহিক শেষ॥

আজি সুপ্রভাত স্বদেশ তোমার,
শুভাগত ইনি তোমার ভূমে।
সাদরে ইহাঁরে করি সম্ভাষণ;
হৃদয়ে ধর মা আশীষি তাঁরে॥

ধন্য ধন্য আজ ধন্য মাতৃভূমি
আসিলে হে তুমি ওহে দয়াময়
ঈশ সন্নিধানে চাহি মনে প্রাণে
হউক তোমার এ পদ অক্ষয়॥

কিন্তু যদি হায়! ভারত রতন,
দৈব নিবন্ধনে এ দেশ ত্যজহ।
এই মাতৃ-ভূমি হবে মরুভূমি;
হাহাকার রবে পুরিবে সব॥

শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী
রহমতপুর-স্কুলসম্পাদক।

"রাগিনী ললিত তাল আড়া"।

এস দেব, এস এস বঙ্গমার সাধের সন্তান।
মুছিয়া মায়ের অশ্রু, লাভ কর যশ মান॥
মা মোদের বড় দুঃখে, পাষাণ বাঁধিয়া বুকে,
সাড়ে সাত শত বর্ষ, শোক শয্যাতে শয়ান।

মার মুখে একবার, নাহি দেখি হাসি আর,
অন্ন চিন্তা চমৎকার, ছেঁড়া বাস পরা;
শুষ্ক দেহ রুক্ষ কেশ, যেন কাঙ্গালিনী বেশ,
চক্ষে নাহি নিদ্রা লেশ, সদাকাল ম্রিয়মাণ।

পরমুখ তাকাইয়ে, পরমন যোগাইয়ে,
পর খাটুনী খাটিয়ে, কৃশাঙ্গ মলিনা;
তোমা হেন পুত্রবরে, পাঠালেন দেশান্তরে,
বিদ্যা শিখিবার তরে, গৃহ তামসী সমান।

বুকে পিঠে কোলে হায়, ছয় কোটী নিদ্রা যায়,
জরাজীর্ণ মরা প্রায়, না অন্ন না বাস;
মরা সুত কোলে করি, কান্দি দিবা বিভাবরী।
গঙ্গা পদ্মা অশ্রু বারি, শোক সাগরেমিশান॥

তোমা হেন পুত্রে মার, সে দুঃখ মোচনে ভার,
তোমারে পাইয়ে তাঁর, কত সুখ আজ;
তুমি মনস্তত্ত্ববিৎ, তোমার কি অবিদিত,
কেন সবে প্রফুল্লিত, হেরি তব ও বয়ান।

তুমি সে মৃতের আগে, তোমাতে সকল লাগে।
সে সবার অনুরাগে, তুমি হবে যোগী;
যোগে যোগাইয়ে যন্ত্র, পড়ি সঞ্জীবনী মন্ত্র,
মৃত দেহে নব প্রাণ, তুমি করিবে প্রদান।

এ ধারণা মনে মার, এক পুত্র তুমি তার।
একচন্দ্র স্তমো হন্তি, নচ তারা গণৈরপি।
এপ্রার্থনা করি দেব, হেন কাজে মায়ে সেব।
সাধিতে এ গুরু কাজ, হও চির বলবান॥

বাসন্দা স্কুলের ছাত্রগণ নিম্নলিখিত গীত গাইয়াছিল।

এস এস প্রভু ভারত রতন।
তোমারে হেরিয়া আজ হলো পুলকিত মন
আমরা তরল মতি, কি করিব তব স্তুতি,
আনন্দ উচ্ছ্বাস শুধু করহে গ্রহণ।
তব শুভ আগমনে, আনন্দ উথলে মনে,
ভক্তি হায় ও চরণে করিহে অর্পণ।
করি মোরা এ মিনতি, ভারতের হিতে মতি
থাকে যেন মহামতি, করি এই নিবেদন।
এস কবিবর এ দীন আগারে তুমি
বঙ্গের উজ্জ্বলমণি, কি দিয়ে পূজিব
তোমা, দীন মোরা তব যোগ্য উপহার
লহ ভক্তি প্রেম হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা
দিব তা সকলি। শুধু এই ভিক্ষা যাচি
এসকল বিনিময়ে পাই যেন তব
হৃদয়ের ভালবাসা অনন্ত বিশাল।
যাঁহার কল্পনা বলে সমর কুশল
সবল উৎসাহপূর্ণ সাধু ইন্দ্রনাথ
দেখাইল জীবনের জীবন্ত আদর্শ
বিলাসী উদ্যমহীন ভীরু বাঙ্গালীরে
(হবে কি সে দিন অভাগা বঙ্গের ভাগ্যে
জন্মি শত ইন্দ্রনাথ প্লাবিবে বঙ্গেরে
নিবারিবে অত্যাচার? স্রোত দুর্বিষহ?
কি সে অত্যাচার। স্মরিলে বিদরে হিয়া
নিবারিবে অত্যাচার বঙ্গের অদৃষ্টে
আশা মরীচিকা তাহা সুদূর স্বপন।)
যে চিত্রিল হল্‌দি ঘাটা সমর প্রাঙ্গন,
প্লাবিয়ে যবন রক্তে, তা সহ মিশালে
প্রতাপের বীর্য্য রাশি, অতুল জগতে,
যে দেখাল মহারাষ্ট্র পতি শিবজীর
নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রেম আদর্শ সুন্দর
আহা সে বিশাল হৃদি জ্বলন্ত উৎসাহ
স্মরিলে হৃদয়ে হয় ভকতি সঞ্চার
(বঙ্গবাসী!) ধরিতে শিখিলে তব সঙ্কীর্ণ-
হৃদয়ে, স্বদেশ স্বজাতি প্রেম সে মহান্ ভাব?
কোথা সে নরেন্দ্রনাথ, যোগী উদাসীন
কে পরাল তব অঙ্গে নবীন সুন্দর
যোগী জন সাজ? কার জন্য বল তুমি
সর্ব্ব তেয়াগিয়া আসিলে কানন মাঝে
সন্ন্যাসীর বেশে? ধন্য তব স্বার্থত্যাগ
যে তোমা শিখাল যোগ, যাহার কল্পনা
সৃজিল সরলা বালা সরলা সুন্দরী,
যে দেখাল চিত্রি বীরাঙ্গনা বিমলারে
ভিখারিণী বেশে ইন্দ্রনাথের সমীপে,
আবার অরাতি দুর্গে লক্ষ শত্রু মাঝে
রুগ্ন শয্যা পাশে সেবিত সে ইষ্টদেবে।
আগত দুয়ারে সেই বঙ্গ-কবিকুল-রত্ন
এস ভাই পূজি তাঁরে ভকতি কুসুমে
একান্ত পেয়েছি যদি নারি উপেক্ষিতে
এ হেন রতন মোরা, তাই বলি ভাই
প্রতি কণ্ঠে গাহুক সঙ্গীত সুলহব
বাজুক আনন্দবাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে
উৎসবে মাতুক সবে, গাহুক বিহঙ্গ
সুমধুর কলস্বরে বিদারি গগণ।
ফুটুক কুসুমরাশি সৌরভ বিতরি
হাসুক সোহাগে সেই সর সোহাগিনী
বিমল সলিলে, উজলিয়া দশ দিক্
নাচুক বালকবৃন্দ দিয়া করতালি।

কবিবর,

যে দিন শুনিনু মোরা উন্নমিত তুমি
ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে, হল মণিকাঞ্চনে জড়িত,
কি বলিব কত সুখ,কত আশা উপজিল মনে
ভাবিলাম সেই অত্যাচারে উৎপীড়িত
এই দুই বৎসর বঙ্গবাসী ছাত্রবৃন্দ
অন্ততঃ বঙ্গের একটী বিভাগ হইতে
হবে তিরোহিত সেই অত্যাচার স্রোত,
দেখিবে কি সুধীবর, নয়নে
বঙ্গের ভবিষ্য আশা বালক নিচয় ?
মিট মিট জ্বলিতেছে সেই আশা দীপ,
নির্ব্বাণ কবো না তায় একই ফুৎকারে
যাচি এই ভিক্ষা তব ও পদ রাজিবে।
সুখে থাক সুধীবর আশীর্ব্বাদ করি,
দুষ্টের দমন কর, শিষ্টের পালন
সুখে থাক তব যত পুত্র কন্যাগণ।
একমাত্র ভিক্ষা যাচি ও পদ পঙ্কজে
অবোধ বালক মোরা থাকে যেন মনে
আমাদের ভক্তিপূর্ণ সরল হৃদয়।

একান্ত অনুগত
বাসাণ্ডা স্কুলের ছাত্রগণ।
১২৯১ সাল, ২৮শে আষাঢ়।

সপ্তাহে দুই দিবস বাখরগঞ্জ জিলায় স্থানে স্থানে হাট হয়। সেই দিবস অসংখ্য লোক নৌকা করিয়া ১০।১২ মাইল দূরে হাটে যাইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে। সেই সময় এই স্থানসকল লোকে পরিপূর্ণ ও কোলাহলময় হয়। সমস্ত দিবস হাটে দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় হয়, সন্ধ্যার ছায়া পতিত হইলে গ্রামবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হয়। যখন আরোহীদিগের ক্ষুদ্র তরণী সকল জলে ভাসিতে থাকে, সেই দৃশ্য অতি মনোহর। তামাক, মৎস্য, কলাই, চাউল, গুড়, লবণ, ধুতি সাটী ইত্যাদি দ্রব্য সকল তাহারা খরিদ করিয়া লইয়া যায়। এই দেশের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অধিক। নারিকেল ও সুপারি অপরিয্যাপ্ত এখানে উৎপন্ন হয়। এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহাদিগের যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন হয়। বাখরগঞ্জ জিলায় স্থানীয় জমিদারগণের বাসস্থান না থাকায় জমির উপসত্ব প্রজারা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করে। এখানকার কৃষিজীবিদিগের অবস্থা বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশের কৃষক অপেক্ষা ভাল। ইহারা অলস, অল্প পরিশ্রমে

প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হয়। বিবাহ উপলক্ষে ও পার্ব্বণে ইহাদিগের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

এখানে প্রায় সকল কৃষক রমণীর গাত্রে রৌপ্য অলঙ্কার আছে।

দুঃখের বিষয় এই জিলার লোক বড় দুর্দ্দান্ত ও মোকদ্দমা-প্রিয়। বাখরগঞ্জ জিলা অপেক্ষা বাঙ্গালার কোন জিলায় নরহত্যা ও মিথ্যা মোকদ্দমা এত অধিক নহে। এই জিলার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি মুসলমান ও নীচ জাতি হিন্দু। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর বসবাস এই স্থানে অল্প। এই জিলার উত্তর ভাগে গৈলা গাভা ও বানরীপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সকলে শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকের বাসস্থান আছে।

এইস্থানে চাউলের খরিদ বিক্রয় অধিক হয়। এক বৎসর মধ্যে সাহেবগঞ্জ নামক স্থান হইতে ১০ লক্ষ মণের অধিক চাউল কলিকাতায় রপ্তানি হইয়াছিল। বাণিজ্য ও ব্যবসা দ্বারা কি প্রকার অর্থ উপার্জ্জন ও অবস্থার উন্নতি করা যাইতে পারে এখানকার লোকদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করা যায়। চৌদ্দ বৎসর ক্রমাগত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিবার পর রমেশ বাবু দুই বৎসর কালের জন্য অবসর গ্রহণ করিলেন। ১৮৮৫ সনে বাখরগঞ্জ জিলা পরিত্যাগ করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া এক বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া ঋগ্বেদ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন। পূর্ব্বে বেদ উচ্চারণ বা তাহার আলোচনা করা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির নিষিদ্ধ ছিল। দেশীয় ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে বেদপাঠ ভুলিয়া গিয়াছেন! ইউরোপ খণ্ডে জারমান ও অপর জাতিরা তাহাদিগের ভাষায় বেদ অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশে ইহা অনুবাদ করিতে এ পর্য্যন্ত কেহ সাহস করেন নাই। রমেশ বাবু ঋগ্বেদ সংহিতা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করায় দেশমধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কুসংস্কারাপন্ন পণ্ডিতাভিমানী লোকেরা একেবারে

জ্বলিয়া উঠিল, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রিকায় উভয় পক্ষের যুক্তি ও বাদানুবাদ বাহির হইয়াছিল। বোধ হয় পাঠকগণ তাহার সবিশেষ বিবরণ অবগত আছেন।

এই কার্য্য সমাধান করিয়া রমেশ বাবু বিলাত যাত্রা করেন; এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাবনা জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়েন।

পূর্ব্বে বাল্যাবস্থায় তিনি এই স্থানে একবার আসিয়াছিলেন। শৈশবে যে স্কুলে তিনি কিছুকালের জন্য শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি বিরাজ করিতেছে। উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন, পূর্ব্বের ছাত্রকে উন্নত পদস্থ দেখিয়া চিনিতে পারিলেন ও তাঁহার মনে আনন্দ হইল। শৈশবকালে পিতার সহিত রমেশ বাবু যে বাটীতে বসবাস করিয়াছিলেন, যদিও তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তত্রাচ তিনি দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, পাবনায় যে গৃহে তিনি এক্ষণে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বাস করিতেছেন, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই গৃহে ম্যাকবেথ্ (Macbeth) নাটক ইংরাজ সৈনিক পুরুষ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। রমেশ বাবু ছয় মাসকাল পাবনায় ছিলেন তাহার পর ময়মনসিংহ জিলায় বদলি হইলেন।

এই সময়ে মৈমনসিংহ জিলার শাসন কার্য্যে বড় গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। জামালপুর মহকুমায় একটী মেলা হইত, সেই মেলা সম্বন্ধে তৎকালের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্য লইয়া বড় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। টাঙ্গাইল মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের কার্য্যের বিরুদ্ধে জমীদার ও প্রজাগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিল। নেত্রকোণা মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে একটী মোকদ্দমা স্থাপিত হইয়াছিল। এবং কিশোরিগঞ্জ মহকুমাতেও নানারূপ গণ্ডগোল

হইতেছিল। এই সমস্ত গণ্ডগোল থামাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট রমেশ বাবুকে মৈমনসিংহে পাঠাইলেন। সুখের বিষয় রমেশ বাবু মৈমনসিংহে যাইয়া ছয় মাসের মধ্যে শান্তি সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করিলেন।

ময়মনসিংহ জিলার আয়তন ছয় হাজার মাইলের অধিক, লোক-সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। রমেশ বাবু ময়মনসিংহ হইতে কিশোরিগঞ্জ যাইবার একটী পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে নৌকা করিয়া শ্রীহট্ট নিকটবর্ত্তী উক্ত মহকুমার সীমানা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময় গ্রাম সকল জলে বেষ্টিত হইয়া ক্ষুদ্র দ্বীপ সদৃশ বোধ হইত। বর্ষার পর জল চলিয়া গেলে ইহার শোভা অন্যরূপ হইত। ময়মন-সিংহের উত্তর সীমায় গারো জাতি বাস করে। রমেশ বাবু নৌকা করিযা জঙ্গল ও পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া গারো জাতির বাসস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। খাসিয়া ও নাগা জাতির ন্যায় গারো জাতি পাহাড় ও জঙ্গলময় স্থানে বাস করে। তাহাদিগের স্বভাব সরল ও মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল। ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা অতি বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপটু, তাহারা জঙ্গল হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ ও বাটী নির্ম্মাণ করে। তাহাদিগের কন্যাগণ বয়োপ্রাপ্তি হইলে ইচ্ছামত বিবাহ করে।

বাখরগঞ্জের জমিদারেরা তথায় বাস করে না, ময়মনসিংহে সেরূপ নহে। এখানে অনেক ধনশালী জমিদারের বাসস্থান ও তাহাদিগের প্রতাপও অধিক। এখানে অনেক স্ত্রীলোক জমিদার আছে। তাঁহারা সময় সময় সাধারণ হিতকর কার্য্যে অর্থদান করেন।

ময়মনসিংহে সারস্বত ও জমিদার সম্মিলনী নামক দুইটী সমিতি আছে। ইহার দ্বারায় দেশের অনেক হিতকর কার্য্য সাধন হইতেছে। রমেশ বাবু একটী সভার সভাপতি ছিলেন। যাহাতে সভার উন্নতি হয় তিনি কায়মনে চেষ্টা করিতেন।

তিনি এই জিলা সুশাসন ও এখানে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অসৎচরিত্র ও বদমাইস লোকদিগকে শাসন করিয়াছিলেন। প্রবল প্রতাপ দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী জমীদারও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত।

তিনি এখানে জলের কল নির্ম্মাণ করিবার প্রথম প্রস্তাব করেন। ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতে তিনি এইস্থান পরিত্যাগ করেন।

তিনি এই জিলায় অবস্থিতিকালীন ময়মনসিংহবাসীদিগের নিকট হইতে যে সকল পদ্য উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার দুই একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

১

বঙ্গবিজেতা-প্রণেতা পুরুষ রতন ;
কিবা উপহারে আজি করিব পূজন
তোমা হেন সুরতনে, জন্মেছিলে শুভক্ষণে
বঙ্গদেশে, ধন্য তুমি দেশের গৌরব।
তব নামে পুলকিত বঙ্গীয় মানব ॥

২

বিদেশী ইংরেজী ভাষা করি অধ্যয়ন।
লভিয়াছ সব চেয়ে উন্নত আসন ॥
এদিকেতে সুযতনে, মাতৃভাষা অধ্যয়নে
উন্নতি সাধিছ কত কে করে বর্ণন।
তব গ্রন্থ পাঠে কত আনন্দিত মন ॥

৩

দীন হীন ছাত্রগণ আমরা সকল।
সম্ভাষিব তোমা,হেন আছে কোন বল ॥
সূত্র নাহি গাঁথিবার, কিম্বা অন্য অলঙ্কার ;
তবোচিত উপহার কোথায় পাইব।
তব নাম-মালা মাত্র হৃদয়ে রাখিব ॥

৪

কৃতজ্ঞতা-ভক্তিপুষ্প যতনে গাঁথিয়া
এনেছি এ উপহার দিতেছি নমিয়া।
ইহা হতে কি সম্বল, আছে মোরা দিব বল
দয়া করি লও ওহে বঙ্গের ভূষণ।
কাতরে প্রার্থিছি সবে তোমার সদন ॥

একান্ত বশম্বদ
কালীপুর মধ্য-ইংরাজী স্কুলের
ছাত্রবৃন্দ।

৬ই ফাল্গুন ১২৯৪ সাল।

উপহার।

সকলের মন, উৎসবে মগন
নহবৎ কেন বাজে ঘন ঘন ?
কলাগাছ সারি সারি,
লোহিত নিশান ধরি,
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া কার প্রতিক্ষায় ?
কি সুখ হইল আজি টাঙ্গালে উদয়।
সবে হেরি আজি প্রফুল্ল বদন,
পুরবাসী সবে সুখে নিমগন।
নয়নে আনন্দ ভাতি
দেখি এবে দিবারাতি,
হেন অপরূপ শোভা হেরিনি কখন,
হেরিয়ে এ শোভা মরি জুড়ায় নয়ন।
সবার আগে কি দেখিবে বলিয়া,
নাচিছে নিশান হেলিয়া দুলিয়া।
করিবারে সম্ভাষণ
নহবৎ চূড়াগণ
স্থির মতি এক দৃষ্টে আছে দাঁড়াইয়া,
উর্দ্ধমুখে কেন তারা রয়েছে চাহিয়া ?
তব দরশন করিয়া মনন,
পরিয়া নূতন বসন ভূষণ,
জমিদার অগণন,
আজি সুখে নিমগন,
আসিয়া সকলে এবে আমোদে ভাসিয়া
লোজনের ধারে সবে আছে দাঁড়াইয়া।
কেহ নৌকা কেহ বোটে,
কেহ বা আসিছে হেঁটে।
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি দেখিবে বলিয়া
আগমন প্রতীক্ষায় রয়েছে চাহিয়া।

ভারত গৌরব রবি উদিল এ দেশে,
ভাসিছে সবাই তাই মনের উল্লাসে।
কবিকুল শিরোমণি আদর্শ রতন
বীণাপাণি প্রিয় সুত অতি সুশোভন।
দীনা ক্ষীণা বঙ্গভাষা মলিন বয়ান,
শতবর্ষ আয়ু তারে করিলা প্রদান।
কার সাধ্য তব গুণ করিতে বর্ণনা,
কোনজন হতে পারে তোমার তুলনা।
স্বর্গীয় বদন তব করি নিরীক্ষণ,
সবার মিটিল সাধ ঘুচিল বেদন।
বড় পুণ্যবতী দেব! তোমার জননী,
পবিত্র হৃদয়া দেবী সতী শিরোমণি।
তাঁর পুণ্যফলে তব যশের সৌরভ,
ছুটিতেছে চারিদিকে— বাড়িছে গৌরব।
এই ভিক্ষা কালী পদে,
চিরদিন নিরাপদে,
থাকিয়া আপন যশে হাসাও ভুবন।
কর দেব স্বদেশের কল্যাণ সাধন,
দয়া করে আপনার অনুগত জনে।
কৃপা দৃষ্টি করিবেন প্রফুল্ল বদনে।
জ্ঞানহীনা বঙ্গনারী কি সাধ আমার।
তব সম গুণবানে দিতে উপহার।
তথাপিও আশা মনে,
মহোদয় নিজগুণে,
সামান্য কবিতা মোর লইয়া আদরে
মহত্তের পরিচয় দিবেন সবারে॥

টাঙ্গাইল ভূতপূর্ব্ব
ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের পত্নী কৃত।

টাঙ্গাইল বার লাইব্রেরী।

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

ধন্য হলেম সবে,
তব শুভ আগমনে।

২

কি দিয়ে তুষিব বল,
ভাবিয়া না পাই মনে।

৩

তুমি হে গৌরব রবি, ভারত গগণে,
উজলিছ দশদিশ, সুযশ কিরণে।

৪

সাধি আযাস অপার,
সাগর হইয়ে পার,
সুদূর বিলাত ভূমে
লভিলে বিদ্যা অমূল ;
নিজ দেশে আসি পুনঃ অসাধ্য সাধনে,
রাখিলে অক্ষয় কীর্ত্তি অতুল ভুবনে।

৫

তব সব গ্রন্থাবলী,
দেশের মুখ উজলি,
ঘোষিছে বিমল যশ,
দেশ দেশান্তরে।
থাকহ অতুল পদে, শান্তি সুখ সম্পদে,
এই ভিক্ষা এক মনে, যাচি হে বিভু চরণে॥

বিদায় সঙ্গীত।

রাগিণী জয়ন্তি—তাল আড়া।

একিরে বিষাদ হায় আঁধার নির্ম্মল নিশি।
আজি কেন মেঘ আড়ে লুকাইল পূর্ণশশী॥
কাতর চকোর শ্রেণী, ম্লানমুখী কুমুদিনী,
বাকা রজনীতে অই খেলিছে চপলা রাশী॥
সুশীতল করদানে, কে তুষিবে জনগণে,
এ জীবনে কবে সবে হাসিবে আনন্দ হাসি॥

বেহাগ—আড়া।

চলিলে রমেশচন্দ্র বিষাদে ডুবায়ে।
ফুরাইল শুভ আশা তোমারি বিদায়ে॥
তোমাকে বিদায় দিয়ে, থাকিব শূন্য হৃদয়ে
কেমনে ভুলিব দেশ বৎসল তোমাযে॥
অভাগী ভারত মার, তোমা হেন কেবা আর,
খাটিয়াছে উদ্ধারিতে লুপ্ত ইতিহাস।
নানা কুসংস্কারে, ডুবেছিল অন্ধকারে,
আলোক আনিলে দেশে বেদ প্রকাশিয়ে॥
দুষ্টের পীড়ন হতে, (আমায়) রক্ষিতেছ নানা মতে,
কত কষ্ট করিয়াছ মোর উপকার তরে।

খোলা ভাটী তুলিয়াছ, কত লোকে বাঁচায়েছ,
(কব) কত কার্য্য করিয়াছ তব শাসন সময়ে ॥
ক্রমোন্নতি লাভ কর, মার মুখ উজ্জ্বল কর,
দূবে থাকি সুখী হব তব যশোগান শুনি।
বসিলে রাজ আসনে, চাহিও মায়ের পানে,
জীবন প্রভাত বঙ্গের হবে সেই সুসময়ে ॥
যেখানে সেখানে থাক, দূর ভুমে ভুলনাক,
বলি আজ তোমাকে এই শেষ কথা।
দয়াময়ী ভারতেশ্বরী, কল্যাণ করুন তোমারি,
পরমেশ (সুখময়) দীর্ঘ জীবন দিউন তোমায়ে ॥

ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহের উক্তি।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

যাবে কি হে মহামতি যাবে কি তুমি এখনি।
এত ত্বরা চলে যাবে স্বপনেও নাহি জানি ॥
সদা সহাস্য বদন, প্রফুল্ল যুগ্ম নয়ন
কেমনে ভুলিব তোমার প্রেমপূর্ণ মিষ্টবাণি।
অতি ভদ্র ব্যবহারে, তুষিয়াছ সবাকারে
তাই তোমারে ঘবে ঘরে, আশীর্ব্বাদ করে শুনি ॥
কত যত্ন কত শ্রমে, ভ্রমিয়াছ গ্রামে গ্রামে,
কাঁপিয়াছে দস্যুগণ দণ্ডের বিধান শুনি।
স্থাপিয়াছ শান্তি দেশে, প্রশান্ত গম্ভীর বেশে
গিয়াছ সর্ব্বত্র তুমি, প্রীতির আহ্বান শুনি।
সারস্বত রঙ্গভূমে, জমিদার সম্মিলনে,
খাটিয়াছ মনে প্রাণে, ডাকিয়াছে যে যখনই ॥
তুমি বঙ্গেব অলঙ্কাব, গাম্ভীর্য্যের পূর্ণাধার,
কি পাপে এ হেন ধনে, হাবাই তাহা নাহি জানি।
ধিক্‌রে বরষা তোবে, তোমাবইতো অত্যাচারে,
ছাড়ি চলিল আমাবে বঙ্গের উজ্জ্বল মণি ॥
নিম্ন ভুমি ভিজা স্থান, নাহি উচ্চ বর্দ্ধমান
কেমনে রাখিব তোমায় স্বাস্থ্যের কবিয়া হানি ॥
যাও তবে প্রিয়তম, এই আশীর্ব্বাদ মম,
রাখিবেন সুখে তোমায় জগৎ জননী যিনি ॥

স্থানীয় "চারুবার্ত্তা" সম্পাদক রমেশবাবুর ময়মনসিংহ জিলার শাসন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

আর এক সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার পরই ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের শাসন কাল শেষ হইবে। শাসন সম্পর্ক ঘুচিবে, কিন্তু স্বদেশ-সম্পর্ক ছিন্ন হইবার নহে। বঙ্গদেশের সঙ্গে তিনি কেবল শাসন সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত নহেন। তিনি এখানে আসিবার পূর্ব্বে পরিচিত, পরেও ততোধিক পরিচিত থাকিবেন। রমেশচন্দ্র স্বদেশী, স্বদেশবাসী, স্বদেশানুরাগী, শাসনকর্ত্তা।

যতকাল বাঙ্গালা সাহিত্য, ততকাল তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। আমরা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সমালোচনা করিতে চাই না। না চাহিলেও একটী কথা বলিব, যিনি জয়সিংহের মুখে এই মহাবাক্য উক্ত করিয়াছেন,—"সত্যপালনে যদি সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্ঘনে হইবে" তিনি সাহিত্যের সম ধরাতল হইতে বহু উর্দ্ধে, কোথায় কোন্ রাজ্যে, কোন দেশে, কোন নিবাসে, আমরা এখানে সে বিষয়ে নির্ব্বাক থাকিতে বাসনা করি।

আমরা রমেশচন্দ্রের শাসনকাল হইতে "শান্তি ও শাসন" সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। ব্যবহার জীবের রসনা, অর্থী প্রত্যর্থীর জয়াজয়, দোষ দর্শীর বঙ্কিম কটাক্ষ আমরা সেদিকে নির্ভর করিতে চাই না। ইহার শাসনপ্রণালী উপলক্ষে কয়েকটি সাধারণ সত্যালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য আমরা তাহাই করিব।

রমেশচন্দ্রের কতকগুলি সৎকার্য্যের বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কেবল আমরা নহে, আমাদের কোন কোন সহযোগীও আমাদের সঙ্গে একমত হইয়াছেন। আমাদের সাধারণ সত্যকথা এই,—শান্তিতেই শাসন সৌন্দর্য্যের পরিসমাপ্তি। যে শাসনে শান্তির অনুসরণ করে না তাহা শক্ত শাসন হইতে পারে, কিন্তু জ্যোতি-প্রীতিময় সুশাসন নহে। অনেক সময় ইংরেজ শাসন যে শক্ত শাসন বলিয়া অপবাদগ্রস্ত হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র কারণ এই যে, তাহা আভ্যন্তরিক শান্তির অনুসরণ করে না, উহা শাস্তির অনুসরণ করে। দণ্ড, দলন, তাহার একমাত্র অবলম্বন। দণ্ডভয়, দলন বিভীষিকার যে শান্তি তাহা শান্তি নহে—তাহা অগ্নিগর্ভ পাত্রে লৌহ আবরণ মাত্র। রমেশচন্দ্রের শাসন কাল যদি কেহ সুক্ষ্মরূপ আলোচনা করিয়া থাকেন, তবে তিনি দেখিয়াছেন, রমেশচন্দ্র একজন প্রধান শান্তি সংস্থাপক। যাহা করিলে, যে উপায় দেখাইলে শক্ত শাসনের প্রয়োজন হইবে না, তিনি তাহাই করিতে যত্নবান। তিনি উপসর্গ হইতে মূল রোগে, মূলরোগ হইতে রোগের মূলে ঔষধ প্রদানলিপ্সু। যাঁহারা তাঁহার এই চরিত্র লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার এই প্রশান্তির প্রশস্ত নীতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন ভারতবর্ষে কোন্ শ্রেণীর শাসনের প্রয়োজন; দেশীয় শাসন কর্ত্তাগণ যে এ দেশের

উপযোগী তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা শত প্রকারে ইউরোপের শাসনের অনুকরণ করিলেও দেশের সৌম্য শাসনের ছায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যিনি এ দেশের অন্নজলে অকৃতজ্ঞ নহেন, তিনি শান্তির পথানুসারী শাসনকর্ত্তা হইবেন ইহা তাঁহার প্রকৃতি সিদ্ধ, এ দেশবাসীর প্রকৃতির উপযোগী আমরা সে কথার আভাস দিয়াছি—রমেশচন্দ্র স্বদেশের অন্ন জলের কৃতজ্ঞ সন্তান। তিনি এই অল্প কতিপয় বর্ষে—শতবর্ষ হইতে অধিক শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষা দিয়াছেন—ভারতবাসী আভ্যন্তরিক শান্তির ভিখারী। যে শাসনে খড়ো খড়ো, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, গৃহে গৃহে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় রমেশচন্দ্র তাহার পক্ষপাতী নহেন।

ময়মনসিংহের ন্যায় বিস্তৃত জেলায় কখন স্বদেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট আগমন করেন নাই। মনুষ্য মাত্রেই ভ্রম প্রমাদের বশীভূত। রমেশচন্দ্র ভ্রম প্রমাদের অতীত এ কথা কে বলিবে। স্বদেশীয় শাসনকর্ত্তার গৌরব কি তিনি তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শাক্ত শাসন এবং বৈষ্ণব শাসনে প্রভেদ কি ময়মনসিংহবাসী একথা বুঝিতে পারিবে। রমেশচন্দ্র বর্দ্ধমান যাইতেছেন, বর্দ্ধমানে তাঁহার শাসন নীতির মূল—বৈষ্ণবনীতি, শান্তিনীতি বর্দ্ধিত হউক আমাদের এই একমাত্র বাসনা।

১৮৯০ সালে তিনি বর্দ্ধমানে বদলি হইলেন; বর্দ্ধমান পূর্ব্বে স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, পীড়িত লোক এখানে আসিলে স্বাস্থ্যলাভ করিত। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশ ব্যাপিয়াছে, বাঙ্গালার পশ্চিম দেশ সকল, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর হইতে পূর্ব্ব সীমা যশোহর পর্য্যন্ত এই পীড়া বিস্তৃত হইয়াছে, কতকাল যে এই ম্যালেরিয়া জ্বর লোক সংখ্যা হ্রাস করিবে, তাহা বলা যায় না।

এই জিলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জের কোন কোন স্থানে পাথুরিয়া কয়লা ও লৌহ উৎপন্ন হয়। এখানে উত্তম উত্তম মৃণ্ময়পাত্র প্রস্তুত হয়।

রমেশবাবু বর্দ্ধমান জিলায় অবস্থান করিবার সময় একবার দামোদর নদীতে বর্ষাকালে জল বৃদ্ধি হইয়া দক্ষিণ দিকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই কথা লোকেরা রমেশবাবুর কর্ণগোচর করিল, তিনি অবিলম্বে এঞ্জিনিয়ার, পুলিশ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য লোক সমভিব্যাহারে উক্তস্থানে উপস্থিত হইলেন। এবং প্রজাদিগের অবস্থা উত্তমরূপে

তদন্ত করিয়া তাহাদিগের সাহায্যের জন্য উচিত উপায় বিধান করেন। রমেশবাবুর এই কার্য্যে তাঁহার দেশময় সুখ্যাতি হইয়াছিল, লোকের মুখে ও সংবাদপত্রে তাঁহার প্রশংসার কথা শুনিয়াছিলাম, কলিকাতার "বঙ্গবাসী" কাগজে পর্য্যন্ত তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিল। তাঁহার সৌজন্যতায়, মিষ্ট কথায় ও ভদ্র ব্যবহারে সকল লোক বশীভূত হইত। বর্দ্ধমান ষ্টেটের ম্যানেজার ও সর্ব্বময় কর্ত্তা রাজা বনবিহারী কর্পূর মহাশয় তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতেন।

রমেশবাবু বর্দ্ধমান হইতে দিনাজপুর জিলা এবং তথা হইতে ১৮৯১ সালে মেদিনীপুর জিলায় বদলী হইলেন। এই জিলার অন্তর্গত তমলুক পূর্ব্বকালে একটী বন্দর ও প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এক্ষণে সমুদ্রের গতি পরিবর্ত্তন হওয়ায় নিম্ন ভূমি ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া বৃহৎ স্থলভাগে পরিণত হইয়াছে। মেদিনীপুরের প্রাকৃতিক গঠন বাঁকুড়ার ন্যায়, ইহার পূর্ব্ব সীমার জমি সৈকত ও কৃষি উপযোগী, এখানে অনেক লোকের বাসস্থান। পশ্চিম প্রদেশ উচ্চ ও পাহাড়ময়, জঙ্গলে ও উচ্চ উচ্চ শালবৃক্ষে আচ্ছাদিত। দক্ষিণে সমুদ্র। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, সুবর্ণরেখা নদী উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর জিলাকে বিভক্ত করিয়াছে। রমেশবাবু মেদিনীপুরের কলেক্টর থাকিয়া দেশের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, গড়বেতার রায়তদিগের উপর নীলকরদিগের পীড়ন ও অত্যাচার অনেক নিবারণ করিয়াছিলেন। এবং ঘাঁটাল মহকুমা কিছুদিনের জন্য গড়বেতায় স্থানান্তরিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ আনাইলেন। পূর্ব্বে পথকর আদায় সম্বন্ধে অনেক গোলমাল ও বিশৃঙ্খল ছিল। অনেক জমীদারের নিকট হইতে অন্যায় পূর্ব্বক পথকর আদায় করা হইত, রমেশবাবু এই অতিরিক্ত পথকর আদায় করা নিবারণ করিয়া জমীদারদিগের উপকার করিয়াছিলেন।

কোর্ট অব্ ওয়ার্ড (Court of Ward) বিভাগের কার্য্য সুশৃঙ্খল পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইত না। সেই কারণ নাবালক জমীদারদিগের অনেক ক্ষতি হইত, তিনি সুনিয়ম ও উত্তম বন্দবস্ত দ্বারা তাহাদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় জিলা বোর্ডের অর্থ পরিমিত রূপে ব্যয় হইত, অন্যায় ও অহিতকর কার্য্যে সাধারণের অর্থ ব্যয় করা তিনি অনুচিত বিবেচনা করিতেন। শীতকালে যখন মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইতেন, দেশের ও শস্যের অবস্থা, লোকের অভাব অবগত হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহাতে তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক আবশ্যকীয় বিষয় জানিতে পারিতেন। তিনি প্রায় সকল থানা ও স্কুল পরিদর্শন করিতেন। জমীদারে জমীদারে, প্রজায় প্রজায়, বিবাদ থাকিলে, তাহাদিগের মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন, যাহাতে উভয়ের মধ্যে সৎ-ভাব হয় তাহার চেষ্টা করিতেন।

তমলুকনিবাসীর আহ্বান সঙ্গীত।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

এস এস হে রমেশ সবে করি আবাহন
ভালবাসা উপহার করহে করে গ্রহণ।
ভারত ভূত গৌরব অতুল জগতে
অজ্ঞান আঁধারে ছিল আর্য্যকীর্ত্তি অগণন
তোমার প্রসাদে এবে সব করি দরশন।
যুগ যুগান্তর হল নব নব আবিষ্কার
করেছিলেন পিতৃগণ মানব হিতসাধন
তোমার প্রসাদে এবে সব করি দরশন।
পঞ্চনদ দেশমাঝে আর্য্য ঋষিগণের
মনোহর শ্যাম গানে মাতিয়াছিল ভুবন
তব প্রসাদে সে গান এখনও করি শ্রবণ।
আর্য্যের পূজা পদ্ধতি যাগ যজ্ঞ আচরণ
নহুদ্দেশ্য পূর্ণ কিবা সব মঙ্গল কারণ
তোমার প্রসাদে সবে করিতেছি নিরীক্ষণ।
গভীর বিস্তৃত আর স্বদেশানুরাগ
বিপুল সহানুভূতি সব মহত লক্ষণ।
শিক্ষিত সদ্বংশজাত অহঙ্কার বিরহিত
ব্যবহার সুমার্জ্জিত উন্নত অন্তঃকরণ।
লক্ষ্মী আর সরস্বতী একস্থানে নাহি রন
তোমারি আলয়ে কেবল দেখি উভয়ে মিলন।
বাঙ্গালী গৌরব তুমি ভারতের সুসন্তান
নিজ গুণে পাইয়াছ সব হৃদয়ে আসন
হতেছে হইবে দেশে সর্ব্বত্র যশকীর্ত্তন।
সুখে থাক সুধীবর ভারতের কার্য্যকর
করুন জগদীশ্বর নিরোগী দীর্ঘ জীবন।

ঘাটাল নগরী—জননীর সাদর সম্ভাষণ।

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল যৎ।

এস এস বাপ আমার হৃদয় আসনে।
হেরি ও চন্দ্রবদনে, তাপিত নয়নে,
তোমার আশা-পথ চেয়ে আমি ধরেছি জীবনে।
পেয়েছি সুপুত্র আমি রমেশ রতনে,
সৌভাগ্য গরিমা আমার বিখ্যাত ভুবনে,
হয়েছি রাজপ্রতিনিধির জননী এক্ষণে,
আমি তাই ঘাটালনগরী করি কতই আশা মনে।
আমি ত কল্পিতা মা নই প্রকৃতি-জননী,
আশীর্ব্বাদ করি, তাত জান গুণমণি,
সন্তানের সুখ দুঃখে হই সুখিনী দুঃখিনী,
একবার মা বলে ডাকনা বাছা ও চন্দ্রবদনে।
দেখ দেখ মায়ের দশা আয়ত নয়নে,
রেখে'ছে কুমুদ ভ্রাতৃগণে সুশাসনে,
আরো কি করিতে হয় কর সুযতনে,
জেনো, মাতৃসেবা সার ধর্ম্ম সংসার ভবনে।

শ্রীশ্রীনাথচরণ মাশান্ত বিরচিত।

১৮৯২ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে (C.I.E.) সি, আই, ই, উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ২১ বৎসর কাল তিনি রাজকার্য্য করিয়া ক্লান্ত বোধ করিলে ১৮৯২ সালে অবসর গ্রহণ করিলেন, তৎপরে কিছু-দিনের জন্য ইউরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলে পর, ১৮৯৪ সালে এপ্রেল মাসে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রাজ-কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনার করিলেন, ইহাতে তাঁহার গুণের ও যোগ্যতার যথার্থ পুরস্কার হইয়াছে। এই পদ পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী প্রাপ্ত হয় নাই। কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছিল, যে এই দায়িত্ব কার্য্য বাঙ্গালি দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে না, তাহারা উচ্চ শাসনকার্য্যের উপযুক্ত নহে। এই কার্য্য করিতে যে সকল গুণ ও

শক্তির আবশ্যক তাহা বাঙ্গালির নাই। কিন্তু রমেশবাবুর কার্য্য-নিপুণতা ও বিচার শক্তি দেখিয়া উক্ত কথা যে নিতান্ত অমূলক তাহার আর সন্দেহ রহিল না। বৰ্দ্ধমান ডিভিজনের কমিসনারী পদের দায়িত্ব অধিক। এই বিভাগে ছয়টী জিলা আছে, যথা বৰ্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, মেদিনীপুর ও হাওড়া, এই জিলা সম্বন্ধীয় সমস্ত রাজস্ব কার্য্য তাঁহাকে তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত। মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও কলেক্টরী বিভাগের কার্য্য সকল তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইত, এই সকল কার্য্য তিনি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কোন প্রকার ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। জিলা সমূহের রেবিনিউ সম্বন্ধীয় আপিল সকল তাঁহাকে বিচার করিতে হইত। তাঁহার বিচার-শক্তি ও আইন-জ্ঞান দেখিয়া সকলে তাঁহাকে প্রশংসা করিত। তিনি সহিষ্ণুতার সহিত সকল কার্য্য করিতেন। তাঁহার কোন কার্য্যে চঞ্চলতা লক্ষিত হইত না। তিনি কমিসনার হইয়া বাঁকুড়া পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন; কলেক্টরীর কার্য্য পরীক্ষা করিবার সময় দেখিতে পাইলেন, যে কলেক্টরীর খাজাঞ্জি তহবিল তছরুপাত করিয়াছে, হিসাব পত্র দেখিয়া ও তহবিল গণনা করিয়া তিন হাজার টাকা তফাৎ হইল, খাজাঞ্জি ইহার কোন কারণ দর্শাইতে না পারায় তাহার নিকট হইতে উক্ত টাকা আদায় হইল। বাঁকুড়া জিলার রোডসেসের কার্য্য বেআইনিরূপে চলিত। জিলার এসেস্‌মেণ্ট অন্যায় বৃদ্ধি হইয়াছিল। রমেশবাবু এই অন্যায় ও অতিরিক্ত এসেস্‌মেণ্ট রহিত করিবার জন্য বোর্ডে লেখেন, এই কার্য্য দ্বারা বাঁকুড়া লোকদিগের নিকট তিনি চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছেন। ইডেন কেনালের জল লইবার জন্য অনেকগুলি সার্টিফিকেট (Certificate) জারি হইয়াছিল, প্রজারা ঐ সার্টিফিকেটে আপত্তি করায় তাহাদিগের

আপত্তি অগ্রাহ্য হয়, কিন্তু রমেশবাবুর নিকট আপিল করায় তাঁহার সুবিচারে প্রজারা সার্টিফিকেট জারি দায় হইতে অব্যাহতি পায়। ১৮৯৫ সালে তিনি বেঙ্গল কাউন্সীলের একজন মনোনীত সভ্য হইয়াছেন।

কৌন্সিলে Certificate আইনটী নূতনরূপে বিধিবদ্ধ হইবায় সময় রমেশবাবু প্রজার হিতকর অনেকগুলি ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করেন; তাহাতে স্বয়ং লেফটেনেণ্ট গবর্ণর কৌন্সিল গৃহে রমেশবাবুর যথেষ্ট সাধুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন রমেশবাবুর বিভাগীয় শাসন কার্য্য সম্বন্ধে ও অনেক স্তুতিবাদ করিয়াছেন। রমেশবাবু অতি গুরু রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও বিদ্যাচর্চ্চা ও পুস্তক রচনা করিয়া সময়ের সংব্যবহার করিতেছেন। এখনকার কৃতবিদ্য যুবা পুরুষদিগের তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরনীয়। রমেশবাবুর চিন্তাশীলতা ও জ্ঞান পিপাশা, বয়োবৃদ্ধি সহকারে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহার পুস্তক রচনা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রশংসনীয়। যদিও তিনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তত্রাচ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা এখন পর্য্যন্তও পরিতৃপ্ত হয় নাই। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি এখনও নূতন নূতন পুস্তক লিখিতেছেন। তিনি মানসিক উদ্যম ও বলবতী ইচ্ছা-শক্তিপ্রভাবে অনেক দুরূহ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি বন্ধুবান্ধবহীন দূরদেশে থাকিয়াও বিদ্যানুশীলন দ্বারায় সুখে সময় অতিবাহিত করিতেছেন।

জাতীয় ভাষার উৎকর্ষ ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, অতএব মাতৃভাষার অনুশীলন ও পুস্তকাদি রচনা করা শিক্ষিত বাঙ্গালির কর্ত্তব্য। বঙ্গবিজেতা, জীবনসন্ধ্যা, মাধবীকঙ্কণ, জীবনপ্রভাত, এই চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সংসার ও সমাজ নামক দুইখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। ঋগ্বেদ

সংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া, এক্ষণে সমগ্র হিন্দু-শাস্ত্রের প্রধান প্রধান অংশ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতেছেন। এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরাজি ভাষায় লিখিয়া দেশের হিতসাধন এবং নিজের যশোবিস্তার করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর ভাষা কোমল, সরস, নবীন, নধর, রমেশবাবুর ভাষা সরস, ভাবপূর্ণ ও গম্ভীর। বঙ্কিমবাবুর ভাষা যেন হাসিতেছে, ধীর, ললিতভাবে কথা কহিতেছে। রমেশবাবুর ভাষা বজ্র নিনাদে কথা কহিতেছে ও গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। বঙ্কিমবাবুর হাস্যরস, রমেশবাবুর বীররস। রমেশবাবুব পুস্তক নৈতিক-বলে বলিয়ান, তাঁহার উপন্যাসগুলির অনেক সংস্করণ হইয়াছে, আমাদিগের দেশের শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করে, কারণ ইহার ভাষা প্রাঞ্জল ও নীতি পরিপূর্ণ।

রমেশবাবুর পাঁচ কন্যা ও এক পুত্র।

রমেশবাবু কৃত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা নিম্নে দিলাম যথা—

১। ঋগ্বেদ-সংহিতা, মূল সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় প্রকাশিত।
২। হিন্দুশাস্ত্র, ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ।
৩। বঙ্গবিজেতা।
৪। রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা।
৫। মাধবী-কঙ্কণ, যমুনায় বিসর্জ্জন।
৬। মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত।
৭। সংসার।
৮। সমাজ।
৯। ভারতবর্ষের ইতিহাস।
১০। ইউরোপের তিন বৎসর বাঙ্গালায় অনুবাদ।

রমেশবাবু বর্দ্ধমান ডিভিজনের কমিশনারী পদ প্রাপ্ত হইলে সেই শুভ সংবাদে বঙ্গবাসীর আনন্দ।

ধন্য ধন্য আজ ধন্য বঙ্গবাসী
কি নব উৎসবে সবে মাতুয়ারা
এমন সুদিন কবে হবে আর
খুলে গেছে শত আনন্দ ফোয়ারা।
ভারতের ভাগ্যে যে পদ মর্য্যাদা,
ঘটে নাই কভু বাঙ্গালী সে পদ
পাইলেন আজ প্রতিভার গুণে
এ হ'তে কি আছে অতুল সম্পদ।
কি সুখ বারতা শুনিনু শ্রবণে,
স্বদেশের মান করিতে বর্দ্ধিত
কে কবে পেয়েছে এ হেন সম্মান
কমিশনারীতে রমেশ ববিত।
বাঙ্গালী বলিযে তুচ্ছ কবে যারা,
দেখুক চাহিয়া বাঙ্গালী রমেশে
মানসিক বলে কত বলীয়ান
কতই যশস্বী স্বদেশে বিদেশে।
কার্য্য পটুতায় ইংরাজ সদৃশ
সুধীর প্রবীণ অগাধ পণ্ডিত
উৎসাহে উদ্যমে অদম্য অটল
স্বাধীন প্রকৃতি সর্ব্বত্র বিদিত।
দেশের কল্যাণে সঁপি দেহ মন
কে খাটিবে এত রক্ত করি জল?
এ হেন সুহৃদ কেবা আছে আর,
নিয়ত কামনা প্রজার মঙ্গল।
সাহিত্য সমাজে স্বনাম বিখ্যাত
সুলেখক বলি সকলে আদরে
উপন্যাস লিখে কতই সুনাম
মাতৃভাষা ঋণী রমেশের করে।
শিক্ষা বিভাগেতে উচ্চ অধিকার
কে পেয়েছে এত তাঁহার মতন
ইতিহাসে তিনি "অথরিটী" আজ
শত মুখে সবে করিছে কীর্ত্তন।
যে দিকেতে চাই সেই দিকে তাঁর
সমকক্ষ লোক দেখিতে না পাই
উদার ইংরাজ গুণ পক্ষপাতী
গুণীর গৌরব করেছেন তাই।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাং কাটয়া।

শেষ।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে রামবাগানের দত্ত বংশের সকলেই খৃষ্টীয়ান, অর্থাৎ যীশুখৃষ্ট উপাসক। তাহা ঠিক নহে। রসময় দত্তের বংশাবলীর মধ্যে অনেকে খৃষ্টীয়ান বটে, কিন্তু পিতাম্বর দত্তের বংশাবলীর মধ্যে কেহই উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। দত্ত পরিবার মধ্যে বিদ্যা চর্চা করিতে প্রায় সকলকেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজিতে পুস্তক লিখিয়াছেন, এবং গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত।

গবর্ণমেণ্ট রমেশ বাবুর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে উড়িষ্যা ডিভিজনের কমিসনার করিলেন।

পূর্ব্বে রমেশবাবু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলিন কবিতা ইংরাজিতে রচনা করিয়াছেন। জনসাধারণের নিকট তাহা প্রকাশিত ছিল না। আমি অনেক চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার দুই চারিটী কবিতা সরল বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

রমেশবাবু তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন।

উৎসর্গ পত্র।

কমলা বিমলা প্রিয় তনয়া আমার।
অকৃত্রিম ভালবাসা নম্র ব্যবহার।
তোমাদের স্নেহ ভাবি প্রফুল্লিত মন।
তোমরা প্রাণের বন্ধু হৃদয় রতন।
তোমাদের মনোহর স্নেহমাখা মুখ।
কোমল ভাবেতে পূর্ণ দেখে হয় সুখ।
শৈশব কালের কথা স্মরণ করিয়া।
স্নেহ ভালবাসা জলে সিক্ত হয় হিয়া।
প্রথমে যখন আমি ছাড়ি গৃহ দ্বার।
ভ্রমিয়াছি জলপথে সমুদ্রের পার।
তোমরা তখন ছিলে নাবালিকা অতি।
হাসি হাসি কচি মুখ সুকুমার মতি।
মাতার আশ্রয়স্থল, সুখের কারণ।
পাসরিত সব দুঃখ হেরিয়া আনন।
বহুদিন পর যবে আসিলাম ঘরে।
সেইরূপ হাস্য মুখ হেরিলাম পরে।
লজ্জা অবনত মুখ, অমীয় বচন।
আসিলে আমার কাছে প্রিয় দরশন।
বহুদিন পরে আমি সতৃষ্ণ নয়নে।
হেরিয়াছি মনভাব আনন্দিত মনে।
প্রস্ফুটিত সেই ভাব বর্দ্ধিত সে আশা।
কোমল স্বভাব তব প্রীতি ভালবাসা।
তোমাদের ভালবাসা উজ্জ্বল কিরণে।
চিরদিন সুখী মন, সুমিষ্ট বচনে।
আশ্বাসিত হয় মন, করিয়া স্মরণ।
আনন্দে আপ্লুত হয় আমার জীবন।
জীবনের প্রিয় বন্ধু বল হে আমায়।
থাকিবে কি ভালবাসা বার্দ্ধক্য সময়?
যে জীবন স্নেহপূর্ণ সমুজ্জ্বল হয়।
সেইজন ধরাতলে সুখী অতিশয়।
তোমরা স্বর্গীয় দূত ধরণী ভিতর
নির্ম্মল সরল মন প্রফুল্ল অন্তর।
তোমাদের দিন যেন সুখে গত হয়।
শোক দুঃখ চিন্তা মনে না হয় উদয়।
নববর্ষ উপহার কর হে গ্রহণ।
পিতৃ ভালবাসা আর স্নেহ সম্ভাষণ।

শারদীয় রজনীতে বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণ।

ত্রিযামা রজনী, শরচ্চন্দ্রের কিরণ
আশু ধান্যে পড়ি হয়, উজ্জ্বল কেমন
সম্মুখে পশ্চাতে চারিদিকে ধান্য ক্ষেত্র
শস্যভরে অবনত, হয় তৃপ্ত নেত্র
আমন ধানের গাছ সবুজ বরণ
পড়িয়াছে তাহে কিবা চন্দ্রের কিরণ
বৃক্ষ-চূড়া শস্য-ক্ষেত্র সামান্য কুটীর
ভারতের স্রোতস্বতী বিস্তৃত গভীর
তাহার উপর পড়ি নিশাকর কর
দিবস বলিয়া ভ্রম হয় হে অন্তর
সর্ব্বস্থান আলোকিত হয় এ সময়
বট বৃক্ষতল হয় অন্ধকারময়
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া ব্যাপিয়া প্রান্তর
বিস্তারি প্রকাণ্ড শাখা দিক দিগান্তর
আলোময় চারিদিক শোভা অতিশয়
চির অন্ধকারময় এই বৃক্ষ হয়।
ঈষৎ সবুজ বর্ণ শাখা বিস্তারিয়া
বংশবৃক্ষ স্থানে স্থানে আছে দাঁড়াইয়া
আকাশে হাউই বাজি উঠিয়া সত্তর
নত শিরে মৃত্তিকায় পড়ে অতঃপর
সেইরূপ বংশবৃক্ষ উঠিয়া উপর
নত শির হয় পুনঃ কিছুদিন পর
ক্ষুদ্র পল্লি দেখা যায় সুদূরে কেমন
করিয়াছে বৃক্ষ-শ্রেণী তাহাকে বেষ্টন,
সামান্য কুটীর বনলতা জলাশয়
বড় বড় বৃক্ষ-শ্রেণী শোভা অতিশয়
নিরীহ বিহঙ্গকুল নীড় নির্ম্মাইয়া
সেই বৃক্ষে বাস করে শাবক লইয়া
মানব ভ্রাতার সহ বন্য জন্তুগণে
একত্র করিছে বাস তাহারা সে বনে
বন্য জন্তুগণ হয় অসভ্য যেমন
বনচারী নর হয় অসভ্য তেমন
সকলে নিস্তব্ধভাব করিল ধারণ
পবন বহিছে একা করি শন্ শন্
পক্ষীদের রব আর পুষ্প পরিমল
বিস্তৃত নদীর বক্ষে জল কল-কল
সজাগ কুক্কুর ডাকে চন্দ্রে লক্ষ্য করি
শান্তিভঙ্গ করে তারা শুক্ল বিভাবরি।
গ্রাম্য সঙ্গীতের ধ্বনি অল্প শ্রুত হয়
দূর হইতে ঐ গান মিষ্ট অতিশয়
চিন্তার লহরী হৃদে উঠে সেইক্ষণে
গত জীবনের কথা পড়ে মম মনে
সুখদ নিদ্রায় অভিভূত জীবচয়
অল্প লোক জাগরিত রয় এ সময়
দুঃখে শোকে অভিভূত যাহার হৃদয়
চিন্তানলে দগ্ধ মন সদা যার হয়
গত পাপকর্ম্ম কথা স্মরণ করিয়া
অনুতাপে দগ্ধ হয় যাহাদের হিয়া
সে সকল লোক থাকে করি জাগরণ
নাহি হয় তাহাদের মুদ্রিত নয়ন।
শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদ মনের বেদনা
প্রেমিকের প্রেম চিন্তা প্রেমের ছলনা
জাগরিত থাকে কেহ জরা রোগী পাশে
দুঃখ উপজয় মনে তাহার বিনাশে
ছাড়িয়া গিয়াছে যারা এ বিশ্ব সংসার
দেখিতে পাবে না তাহাদের পুনর্ব্বার
সেই হেতু মন হয় সর্ব্বদা চঞ্চল
মানবের ভাগ্যে হয় দুঃখই কেবল।

জীবনের শেষ স্বপ্ন।

কে বলিতে পারে হায়! জিজ্ঞাসি কাহারে?
আশা ও কামনা কেন হৃদয়ে সঞ্চারে?
আধিপত্য করে মনে ক্ষণকাল তরে
ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ উৎপীড়ন করে
আশা ও কামনা যদি পূর্ণ নাহি হয়
চাহিনাক সে সকল হয় যেন লয়
সমূলে হইলে লয়প্রাপ্ত সে সকল
ভারাক্রান্ত মন হবে শান্তি সুখস্থল।
প্রথম যৌবনে আশা দেখা দিয়া ছিল
ক্ষণকাল সুখে দিন গত হযে ছিল
স্বপ্নসম বন্ধুতাব উজ্জ্বল কিরণ
আলোকিত করেছিল আমার জীবন
ভাবিতাম সেই স্বপ্ন রবে চিরদিন,
কভু না হইবে ইহা কালেতে বিলীন,
বায়ু ভরে শস্য কণা অদৃশ্য যেমন
যৌবন সুহৃৎ হয অস্থাযি তেমন,
আশা, হর্ষ, চিন্তা, ভয় পূর্ণ সদা মন
নিজ কর্ম্মে নিজস্থানে ব্যস্ত বন্ধুগণ।
স্বর্গের কি দুত তুমি প্রিয় ভালবাসা?
তোমার উপব ছিল একমাত্র আশা,
তোমাব সুন্দর মুখ হেবিব বলিযা
সতৃষ্ণ নয়নে আমি ছিলাম চাহিয়া
যুবকের চক্ষে তুমি প্রিয় দরশন
তাহাদের মনে তুমি বহু মূল্য ধন
অকপট ভালবাসা অলীক স্বপন
ক্লেশ পরীক্ষায় পূর্ণ হয় এ জীবন
ভালবাসা লয় পায় অঙ্কুর সময়
মানব জীবন নাহি হয় শীঘ্র ক্ষয়
বজ্রনাদ পর হয় নিস্তব্ধ আকাশ
বিদ্যুৎ আলোক হয় আঁধারে বিনাশ
স্বপ্ন পর স্বপ্ন দেখা দেও বার বার
ছায়া আসি করে স্বপ্ন আচ্ছন্ন আবার
ক্রমে ক্রমে সেই ছায়া ঘনীভূত হয়
জীবনেব আশা হয় অন্ধকারময়।
যৌবন কালের দিন না হইতে গত
নিরানন্দ মন মম থাকিতে জাগ্রত
তবে কেন নূতন কামনা আসি মনে?
নিপীড়িত হয় ইহা তাহার তাড়নে?
এক আশা দূর থেকে হয় দীপ্তিমান
স্বর্গীয় ক্ষণিক দীপ-শিখাব সমান
উচ্চ আশা উত্তেজিত কবে বক্ষঃস্থল
যশ-লিপ্সা উদি, মন করে সমুজ্জ্বল
চেষ্টায় মহত কার্য্য সিদ্ধি হইবারে
জীবন সংগ্রামে জয় লাভ কবিবারে
সে কারণ আশা হয় অন্তরে আমার
মন হয় উত্তেজিত উৎসাহে আবার
যদি এই শেষ আশা না পূবে জীবনে
মাটিতে মিশাক্ দেহ, দুঃখ নাহি মনে।

ভারত ভূমি।

দাঁড়াইয়ে গঙ্গাতীরে, অবসান বেলা
হেরিয়াছি তবঙ্গের অপরূপ খেলা
অতি বেগে জলরাশি আস্ফালিয়া যায়
স্তব্ধভাবে, স্থিরনেত্রে হেরিছি তাহায়
অবাধে স্বাধীন ভাবে ফেনা উদ্গারিয়া
উচ্চ রবে মহাবেগে যাইছে চলিয়া
গম্ভীর বারিধি সম ডাক শুনিয়াছি
উত্থিত উন্মুক্ত উর্ম্মি চক্ষে হেরিয়াছি
যে স্থান হইয়া নদী প্রবাহিত হয়
অনুমানি, সেই দেশ স্বাধীন নিশ্চয়
হায়। সেই স্থান স্বাধীনতা বিরহিত
যে দেশ উপর দিয়া নদী প্রবাহিত।

এই কি সে দেশ যাহা পূর্ব্বে খ্যাত ছিল ?
মহাবল বীরগণ জনম লভিল ?
স্বদেশ হিতের তরে দিয়াছিল প্রাণ
স্বাধীনতা রক্ষা হেতু ছিল যত্নবান,
গিরি গুহা উপত্যকা তাহারা সকলে
স্বাধীন এ দেশ ছিল সকলেই বলে।
বৃথা কি হইবে এই উচ্চ ভেরি রব ?
শুনিবেনা কেহ কর্ণে, রহিবে নীরব ?
জনাকীর্ণ স্থান আর ক্ষুদ্র পল্লি কত
উত্তর না পাই কেন ডাকি আমি যত ?
স্তব্ধ কেন রহিয়াছ মুখে নাহি রব ?
অনন্ত নিদ্রায় বুঝি অভিভূত সব ?
মহত প্রকৃতি তব জন্ম আর্য্যকুলে
গত গৌরবের কথা রহিবে কি ভুলে ?
মনুষ্যত্ব, পরাক্রম শূন্য কি হৃদয় ?
বাতাসে কাঁপিছে দেহ যেন বোধ হয় ?
পূর্ব্ব কীর্ত্তি হইয়াছ তুমি বিস্মরণ ?
পিতৃনাম সুযশ দিয়াছ বিসর্জ্জন ?
কি হইবে উপকার বর্ণন করিয়া
পূর্ব্ব গৌরবের দিন,—গিয়াছে চলিয়া
তেজহীন কবিতায় বর্ণনে কি ফল,
পূর্ব্বনাম, যশরাশি, সদগুণ সকল
প্রাচীন দেশের কথা ভুলিতে না পারি
সেই হেতু কাঁদে মন, ফেলি অশ্রুবারি ঃ
কল্পনা করেছি আমি সে কথা স্মরিব
তব কীর্ত্তি যশ-রাশি মনেতে ভাবিব
মনুষ্য আলয় যবে যশের কিরণ
করেছিল আলোকিত মানব জীবন।
ভারত-তপন হয় উজ্জ্বল যেমন
তব কীর্ত্তি যশরাশি প্রদীপ্ত তেমন
যৌবনের পরাক্রম, চিন্তা শক্তি তব
কবিতা-ভাণ্ডার আর সৌন্দর্য্য বৈভব
সে সকল কথা মনে হইলে স্মরণ
হয় সুখোদয় মনে, প্রফুল্ল বদন।

কনিষ্ঠভ্রাতা বিলাত গমন করিলে—

আশা পূর্ণ হল তব, ছাড়িয়া বন্ধু বান্ধব
গমন করিলে ভ্রাত ! দূরতর দেশ।
যত হবে অগ্রসর, অসীম সাগরোপর,
হেরিবেক জলধির ভয়ঙ্কর বেশ ॥
উপরে নীল আকাশ, ঘন ঘটা পরকাশ,
নিম্নে নীল জলধি ভীষণ বেশ ধরি।
জল যান আরোহিয়া, সমুদ্রের বক্ষ দিয়া,
পক্ষি যেন উড়িতেছে জল-পথোপরি।
সদা সন্দিহান মন, শোকভয় অকারণ,
আলোড়িত করিবেক অন্তর তোমার।
সুখ দুঃখ চিন্তা যত, আসিবেক মনে কত,
সচঞ্চল করিবেক হৃদয় আগার।
প্রিয়জন ভালবাসা, নৈরাশ অপূর্ণ আশা,
উদ্বিগ্ন হইবে মন স্মরণ করিয়া।
যাহাদের তেয়াগিয়া, গিয়াছ তুমি চলিয়া,
সে সকলে ভাবি হবে বিষাদিত হিয়া।
নানাদেশ পর্য্যটনে, নানাবস্তু দরশনে,
নবভাবে পূর্ণ হবে হৃদয় কন্দর।
বাসিতে যাহাকে ভাল, ফেলিবে চক্ষের জল
ভাবী আশা ভাবি হবে প্রফুল্ল অন্তর।
মনে হইতেছে হেন, তুমি জাহাজেতে যেন,
পালভরে সুবাতাসে করিছ গমন।
সমুদ্রের বক্ষ দিয়া, যায় জাহাজ চলিয়া,
উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে হইয়া মগন।
বসিয়া জাহাজ বক্ষে, দেখিতেছ তুমি চক্ষে
ভীষণ অর্ণব-বারি নাহি যার শেষ।
না পারি বলিতে আমি, কিসের লাগিয়া তুমি
চিন্তাযুক্ত মন তব হয় এত ক্লেশ।
কেন যে তোমার মন, হয় এত উচাটন,
মনের উদ্বেগ তব বুঝিতে পারি না।
ছাড়ি প্রিয় জন্মভূমি, তাহার লাগিয়া তুমি
ভাবিছ কি মনে মনে, আমিতো জানিনা।

দূর কর সে ভাবনা, নাহিকর সে কামনা,
মুছেফেল অশ্রুবারি চিন্তা দূর কর।
জীবন তরণী তব, ভাসিল ভীষণার্ণব,
ধর কর্ণ দৃঢ় করি, হও অগ্রসর।
হয়ে অতি সাবধান, চালাও জীবন-যান,
দেখ ঐ কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে তোমার।
ভ্রমণ হইলে শেষ, যখন আসিবে দেশ,
পিতৃগৃহে আসিবেক তুমি পুনর্ব্বার।

সব ক্লেশ দূর হবে, আহ্লাদিত হবে সবে,
প্রবাসের কষ্ট যত না থাকিবে আর।
ধনী বা নির্ধনী হলে, ভাল বাসিবে সকলে,
উচ্চপদ নিম্নপদ না করি বিচার।
সমাদরে সম্ভাষণ, করিবে আত্মীয়গণ,
ভ্রাতৃস্নেহ ভালবাসা লভিবে আসিয়া।
দুঃখেতে যাহার মন, হয় সদা জ্বালাতন,
সুখী হবে সে রমণী, সে দিন স্মরিয়া।

রমেশবাবু তাহার জনৈক বন্ধুকে ইংরাজিতে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন।

যৌবনের কথা বন্ধু! পড়ে কি হে মনে?
প্রথম সাক্ষাৎ যবে হইল দুজনে?
পরস্পর ভালবাসা সৌহার্দ্দ কেমন
সুখে দুঃখে দিন মোরা করেছি যাপন
সে সকল কথা মনে হইলে স্মরণ
স্বপ্ন সম বোধ হয় তাহারা এখন
প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠি পথে ভ্রমিয়াছি
নক্ষত্র আলোক পথে ম্লান হেরিয়াছি
ভ্রমিতাম জনশূন্য পথে এক সঙ্গে
দিন গত করিতাম বিবিধ প্রসঙ্গে
সুখে গত হইয়াছে সন্ধ্যার সময়
হেরিয়া গঙ্গার উর্ম্মি উচ্চ অতিশয়
অনন্ত গম্ভীর রব শুনিয়া শ্রবণে
গান গাহিতাম কত আনন্দিত মনে
বৈকালে নিস্তব্ধভাবে গ্রামের ভিতর
ভ্রমিয়াছি, দেখিয়াছি, দৃশ্য মনোহর
স্বভাবের শান্তমূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে
মৃদু হাসি হাসিয়াছি আমরা দুজনে,

মানবের পাপ দুঃখ স্মরণ করিয়া
ফেলিয়াছি অশ্রুবারি, শোকে মগ্ন হিয়া
কল্পনা করেছি কত কলেজে থাকিয়া
পরিশ্রম করি দিন গিয়াছে কাটিয়া
ভ্রমিতাম ধীরে ধীরে কলেজ পথেতে
হইত কতই ভাব উদয় মনেতে
কথোপকথনে রাত্র করিতাম গত
যৌবন-সুলভ চিন্তা, আহ্লাদে সতত
উচ্চ আশা, কত ভাব মনে ভাবিয়াছি
আশা ভঙ্গ, দুঃখ স্মরি কত কাঁদিয়াছি
একত্রে দুজনে রাত্র করি জাগরণ
ভ্রমিয়াছি, হেরিয়াছি, নক্ষত্র কিরণ
বিভাসিত পূর্ব্বদিক রক্তিমা বরণ
শুনিয়াছি বিহগের মধুর কূজন
জন্মভূমি, বন্ধুতার, দৃশ্য মনোহর
বিদেশে ভাবিলে হয় প্রফুল্ল অন্তর
স্মৃতি পথে ধীরে ধীরে হইয়া উদয়
স্বর্গ-সুখ স্বপ্নসম মিষ্ট বোধ হয়।

সমাপ্ত